চিন্তামণি তীরে

সীমন্তনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

শ্রীসীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত,
১।৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

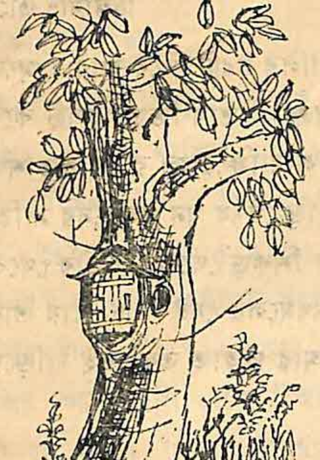
মুদ্রণ : নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩।১, নফর কোলে রোড, কলিকাতা-১৫

রেখা চিত্র ও প্রচ্ছদ শিল্পী :
সুহৃদ মুখোপাধ্যায়

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

স্মৃতিতে—



এক

কাঠবিড়ালির বাসাটা ছিল নদীর ধারে, মস্ত একটা বাদাম গাছের গুঁড়ির ভিতর ছোট্ট একখানি কোটরে। ছোট্ট সেই বাসা, ঠিক মন যেমন চায়। আর গাছের গুঁড়িটা ছিল মস্ত মজবুত আর মোটা। কাঠবিড়ালি থাকত মনের আনন্দে। সারাদিন বাদাম গাছের ডালে ডালে ল্যাজটি পিঠের পরে তুলে খেলা করে। নেই কোন ভাবনা, নেই কোন আপদ বিপদ। কাঠবিড়ালি বেশ মনের সুখেই ছিল।

যখন দুপুরের রোদ গাছের লাল পাতাগুলোকে চড়া রঙে রাঙিয়ে ঝল মলিয়ে তুলত, তখন গান ধরত সে—

লাল পাতা লাল পাতা
রোদে রাঙা দিনমান—
খুশি আমি প্রাণে তাই
দিন ভর গাই গান—

চিন্তামণি নদীর নাম। ছোট্ট সে নদীখান। তোমরা দেখলে বলবে—যাঃ! এ আবার নদী নাকি? এ তো মাত্তর একটা—! কিন্তু আস্তে··· কাঠবিড়ালি শুনতে পাবে! আর শুনলে সে মনে মনে ভীষণ চটে যাবে। কারণ,—চিন্তামণি ছ'ল—'তার' নদী। মানে সে যেমন ছোট খাটো জীব—তেমনি সরু রূপোর মত তার ঐ একরত্তি নদীটুকু। কিন্তু ছোট হলে কি হয়, বাহার সে নদীর একটুও কম নয়। রূপোর জল এঁকে বেঁকে গেছে সোনার দানা দানা বালির মধ্যে দিয়ে। কোথাও মাছের

ল্যাজের মত দু-ফাঁক হয়ে, মধ্যে নরম বালির চরটি ঘিরে আবার জুড়ে গিয়েছে। আর সে জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তার ভিতর চুপটি করে বিছিয়ে লাল নীল গোলাপী হলুদ সাদা আর ফিরোজা রঙের শত শত পাথর কুচি, রং-চঙে ছবির মত। নদীর দু-পাড় ঘেঁষে ঘন খস্‌খসের সারি, সন্ধ্যা হলেই ভুরভুর করে যার গন্ধ বেরোয় শিকড় থেকে। তীর থেকে উঠলেই পা পড়ে ঘাসের পাটিতে। সবুজ মখমলের সেই পাটি, গায় তার খুদে খুদে গোলাপী বেগুনী ফুল তোলা। আর দু'হাত তফাতেই দাঁড়িয়ে মস্ত বাদাম গাছ।

এমন নদীর ধারে বাসা থাকলে কার না মনে একটু গর্ব হয়? কাঠবিড়ালির মনে তাই ভীষণ গর্ব। সে বলে বেড়ায় চারিদিকে,—হ্যাঁ বাসা বাড়ি থাকে সব্বারই। কিন্তু আমার এমন সুন্দর বাসার জুড়ি কোথাও নেই!—এই বলেই ল্যাজটি আরও উঁচিয়ে ডাল থেকে ডালে তুড়ুক তুড়ুক করে লাফিয়ে বেড়ায় গান গেয়ে গেয়ে—

নদীতীরে বাসাখানি
জলছবি আয়না
খুঁজে দেখ পির্‌থিমে
জুড়ি তার পাবে না!

ভোরবেলা নদীর পূবদিকে মস্ত আবীরের গোলা হয়ে সূর্যদেব ওঠেন প্রতিদিন। অমনি কাঠবিড়ালি তার কোটর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ভক্তিভরে সূর্যদেবকে প্রণাম করে। সূর্যদেব তাই সর্বদা খুশি থাকেন কাঠবিড়ালির 'পরে। তাই তিনি বাদাম গাছটায় ঝুলিয়ে রাখেন থোলো থোলো মিষ্টি বাদাম। আর একটা একটা করে তা পেড়ে এনে কাঠবিড়ালি তার ভাঁড়ার ভরিয়ে রাখে। প্রণাম সারা হলে কাঠবিড়ালি তাকিয়ে দেখে,—সূর্যদেবের রথ ঘর্ঘর করে চড়ছে আকাশ বেয়ে; তাঁর লাল টকটকে আগুন রঙের চাদর লুটিয়ে পড়ে বনের গায়, ঝিকিয়ে ওঠে নদীর জলে, রথের চাকা

থেকে সোনার ফুল্‌কি ঠিকরে পড়ে দিকে দিকে। কাঠবিড়ালি দেখে অবাক হয়। অমনি পাখিরা গান গেয়ে ওঠে, হাওয়া বয়ে এসে দুলিয়ে দেয় বাদাম গাছের ফল। আর শিশিরের বুকে রামধনু মণিগুলো জ্বলে ওঠে।

উঠে আসে আবার সিঁড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালি। কারণ এখন তার প্রাতরাশের সময়। তার খাবার ঘরের জানলা দিয়ে টাটকা সোণালী রোদ এসে পড়েছে টেবিলটাতে আর চা-বাসনের গায়ে লেগে ছড়িয়ে পড়েছে দেয়ালে। জানলা দিয়ে কাঠবিড়ালি দেখে চিন্তামণির পাড় ধরে কত পশুপক্ষিরা সব চলেছে যে-যার কর্মে। নিত্য কাঠবিড়ালি দুটো সুগন্ধি ঘাসের গোছা তুলে এনে রেখে দেয় টেবিলে সাজিয়ে। তারপর সে পেলেটে ঢেলে নেয় বাদাম, কুরুম ফুলের পাপড়ি দিয়ে প্রতরাশ সারে।

ছোট্ট বাসাটিতে মোট ঘর তিনখানা,—শোবার, বসবার আর একটা ভাঁড়ার। শোবার ঘরে সাদা ধবধবে শরকাঠির পালঙ্ক। তাতে পাখির পালক কুড়িয়ে এনে মানানসই ছোট্ট এক বিছানা রেশমী ফুলকাটা অড় দিয়ে ঢাকা। ছাদ থেকে ঝোলান একটা ঘাসের বুনুনিতে ঝোলান থাকে ছোট্ট বাতিদান। তাতে সন্ধ্যে হলেই কাঠবিড়ালি একটা জোনাকি পোকা ধরে এনে ভরে রাখে। সারারাত টিপটিপ করে জোনাকি জ্বলে তার শিয়র-গোড়ায়। কাঠবিড়ালির বসার ঘর কিন্তু একটু শৌখিন মত। দুটো আরাম কেদারা, একটা কৌচ, একটা ছোট টেবিল, আর আলমারী। চিন্তামণির কিনার থেকে সে কুড়িয়ে এনেছে অনেক ছোট-বড় রঙীন নুড়ি। একবার বনের মধ্যে গিয়ে পেয়েছিল আশ্চর্য একটা মণি—সেটা সে মাঝখানে সাজিয়ে রেখেছে। রাত্তির বেলা যখন চন্দ্রমা ওঠেন আকাশে,—আর একটা কিরণ তাঁর কোটরের জানলা দিয়ে এসে পড়ে মণির গায়—অমনি সেটা আলোয় ভরে যায়—যেন চাঁদেরই একটি কণা···আর সব যাদুতে মুড়ে যায় !

সাঁঝবেলা কাঠবিড়ালি তার বাসায় ফিরে এসে দরজার মুখ থেকে সিঁড়ি তুলে নেয়। তখন চারিদিকে নেমে আসে নিঝুম রাত। নদীতীর শান্ত হয়ে থাকে। আকাশে তারারা এক এক করে মুখ তুলে তাকায়। অনেক, অনেক দূর থেকে জ্বল জ্বল করে একটা তারা। মোমের মত ঝরে পড়ে

তার আলো। আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি চেয়ে থাকে। আর চিন্তা করে। কত চিন্তা তার। আর সেগুলো প্রত্যেকটাই যেন এক একটা ভারী সুন্দর গল্প···!

বাইরে বনের ছায়া মেলে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে কাঠবিড়ালি ভাবে—যদি সে একদিন বেরিয়ে পড়ে তার এই নদীটুকুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে। ওই গভীর বনের ভিতর। সে শুনেছে বনের শেষ নেই। তার বেজায় ভয় করে কথাটা ভাবতেই। কি নির্নিমেষ চেয়ে থাকে অজগর বন। তার মনের কথাগুলো সব যেন পড়ছে চেয়ে থেকে, যেমন সে গল্পের পাতার হরফগুলো পড়ে। সজাগ হয়ে আছে বন কান পেতে। কাঠবিড়ালি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। ঘরের মধ্যে কি সুন্দর আলো! নরম ভোরের আভার মত, যা শেষ রাতের কপালে হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙায়। কত ভাগ্যবান সে! এমন নিশ্চিন্ত নিরাপদ কোটরখানি তার। কি সুখের···ভাবে কাঠবিড়ালি।

তারপর রাত গভীর হয়···গভীর হয়···। নৈশ খাবারটুকু ভাঁড়ার ঘর থেকে এনে সে খায় কুটুর কুটুর করে। তারপর শুয়ে পড়ে তার পালকের নরম বিছানায়। অমনি ঘুমিয়ে পড়ে। মাথার গোড়ায় জোনাকি জ্বলে টিপ্ টিপ্ করে।

কাঠবিড়ালির প্রতিবেশী অনেক। সবার সঙ্গে অবশ্য তার খুব তেমন একটা ভাব নেই। অনেকে আবার তাকে বেজায় হিংসে করে। যেমন একটু দূরে তেঁতুল গাছের চামচিকে। কিন্তু আরেকটু দূরে গিরগিটি পরিবারের সঙ্গে তার বেশ সদ্ভাব। মাঝে মাঝে গিরগিটি কর্তা-গিন্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে আসেন কাঠবিড়ালির বাসায়। অনেক গল্প হয় তাদের। পাড়া-পড়শীর খবর বলেন গিরগিটি গিন্নী, কারণ সর্বত্রই ডালে ডালে ঘোরেন তিনি। কাঠবিড়ালি প্লেটে করে বাদাম এনে সাজিয়ে রাখে টেবিলে। ছেলে মেয়েরা খায় কুটুর কুটুর করে। বাড়ি ফেরার সময় আবার তাদের হাতে এক একটা করে দেয় সে।

খুব বনিবনা ওদের। কিন্তু সবাই ত তেমন নয়। অনেকে—অনেকেই

হিংসেয় ফেটে মরে। তার শৌখিন আসবাব দেখে তাদের গা জ্বলে যায়। তার ফুলদানীতে ফুল ভরা, আলমারিতে রঙীন পাথরগুলো, সোনার অক্ষরে নাম লেখা তার মোটা মোটা গল্পের বইগুলো—এক কথায় তার সব কিছুকেই। যেমন সেদিন বাদাম গাছের গুঁড়ির কাছে বসে কোলাব্যাং বিশ্রী আওয়াজ করে হেসে উঠেছিল। কাঠবিড়ালি চমকে চাইতেই দেখল কোলাব্যাং চোখ ঠিকরে তাকিয়ে। হাসির রকমটা তার মোটেও ভাল লাগেনি। তাই বলল,—কি ব্যাং কাকাবাবু হাসছেন কেন ?

চোখ পিটপিট করে ব্যাং বলল—না, এই দেখছিলুম !

কি দেখছিলেন ?—অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল সে।

হ্যা ! বলি গোঁফজোড়া ত মন্দ ছিল না দেখতে। বেশ ফক্কড় ফক্কড় দেখাত একর'ম ! কিন্তু সে দুটো না থাকায় দেখাচ্ছে—এ্যাঁ ? হ্যা হ্যা হ্যা !··· মোটা শরীর ফুলিয়ে ফুলিয়ে ব্যাং হেসেই কুটোপাটি।

এ্যাঁ ! কি সর্বনাশ !—চক্ষুস্থির কাঠবিড়ালির। তর্‌তর্ করে গুঁড়ি বেয়ে নেমে ছুট্টে গেল সে নদীর আয়নায় মুখ দেখতে। চোখ ফেটে জল আসছিল তার। অমন বাহারে গোঁফ—নে তবে— ?

টলটল করছিল চিন্তামণির জল। প্রকাণ্ড নীল আকাশ ছোট্ট এক কুচো হয়ে বাঁধা পড়েছে তার বুকে। রোদের চুমকি ছড়িয়ে পড়েছে হাজারে হাজারে। নীল স্রোতের ঝরনা, কখনো ভেঙে চৌচির হয়ে আবার জুড়ে গিয়ে হাসছে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে মনের আনন্দে ! কাশ ফুলের সারি হাওয়ায় নুয়ে পড়ে ফেলে দিচ্ছে মুঠো মুঠো সাদা রেশমের ফুল। কই না তো ! গোঁফ জোড়া যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে—একরত্তিও খোয়া যায় নি ! তবে ? এ সব কোলাব্যাঙের মস্করা ! ভীষণ রাগ হল তার। ফিরে তাকিয়ে দেখল ব্যাং চিৎপাত হয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ! আর আড় চোখে তাকাচ্ছে।

—বেজায় বর্বর আপনি !—তেড়েমেরে বলল সে।—নিজে মাকুন্দে কিনা, তাই অপরের গোঁফ দেখলে ঈর্ষা হয়।

হাঃ ! হাঃ ! বুদ্ধি নেই বাবা একটুও—গোঁফ থাকলে কি হয় ! মস্তকে গোবর ভর্তি !

সকাল বেলা আপনার ঝগড়া না করলেই নয়! আমি কিন্তু তা হ'লে বেজী মামাকে ডেকে আনব।

বেজীর নাম শুনে কোলা ব্যাং সিধে হয়ে বসল। হেঁড়ে গলায় রুষ্ট হয়ে বলল,—আর তুমি বলত বাপুহে কেন রোজ আমার একটা করে জোনাক্ পোকা চুরী কর?

ইস্! আপনার জোনাকী বই কি! ঘাসের মধ্যে জোনাকি সব্বারই! যে পায় তার!

রাগে থপ্ থপ্ করে তিনবার লাফিয়ে উঠে ব্যাং বলল,—গুরুজনদের মুখে মুখে চোপা! খবরদার তুমি আমার জোনাকিতে হাত দেবা না!

আমি দোব! কি করবেন আপনি?

—ঝগড়া হয়ত আরও অনেক দূর গড়াত। কিন্তু ঠিক সেই সময় বাদাম গাছ থেকে একটা টুকটুকে লাল পাতা ঝরে পড়ল চিন্তামণির রূপুলী জলে। একজন ফড়িং এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে তাদের ঝগড়াটা মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ লালপাতা ঝরে পড়তেই সে এককলি গান গেয়ে উঠে চড়ে বসল সেটার উপর। পাতাটা তখন হেলে দুলে ভেসে চলেছে নদীর বুক দিয়ে। খস্খসের বনে ভোরের হাওয়া বইছে শিরশিরিয়ে। ছোট ছোট ঘাসের ফুল-কুঁড়িরা নীল গোলাপী বেগুনী মুখ তুলে তুলে দেখতে লাগল ফড়িংয়ের দিকে। ফড়িং গান গেয়ে চলল সরু মিষ্টি গলায়—

লালপাতা লালপাতা
ডিঙিখানি ভাসিয়ে
চলে যাই—ভেসে যাই—
নাহি চাই—ফিরিয়ে।

—ও ভাই ফড়িং, এট্টু গানটা থামিয়ে আমার সঙ্গে দুটো কথা বল না! কোথায় চললে পাতার নৌকাটা বাইতে বাইতে?—কাঠবিড়ালি পাড় ধরে ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞাসা করল।

গম্ভীর হয়ে ফড়িং চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে। তারপর আবার গান গাইতে শুরু করল—

সেইখানে যেতে চাই
নেই যার ঠিকানা
নেই তার পথঘাট
আছে এক খোলামাঠ
দিনভরা রোদ আর
রাত ঝরা জোছনা।

—তবে কেন যাবে সেখানে? গেলেই ত পথ গুলিয়ে যাবে! তখন বাড়ি ফিরবে কি করে?—ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি।

ফড়িং বলল—বাঃ! এমন বিনে খরচায় নৌকো পেয়েছি, না গেলে কি চলে?

ব্যাপারটা কি ঘটছে ঠিক বুঝতে না পেরে ব্যাং থপ্‌থপিয়ে এগিয়ে এসেছিল। ফড়িংয়ের কথার শেষ ভাগটুকু শুনেই গ্যাঙোর গ্যাং করে অমনি বলল—

বিনে খরচায় চড়া মানে? ও আমার নৌকো! জানিস্ কিরে নদীর ঘাটবন্দী-উশুল-আদায় তামাম শ্রীতিনকড়ি ব্যাং ব্যাঙ্গোপাধ্যায়ের নামে ইজারা কবুলিয়াত করা আছে? ফক্কড় ফড়িং—দে আমার পারানির কড়ি গুণে—এ্যাঁ!

ফড়িং গুলি গুলি চোখ করে অমনি চিড়িক্ চিড়িক্ গেয়ে উঠল—

দোবোনা তোমাকে যাও!
মামলা কর কোথায়—
আমি ততোধিক সুখে
নৌকা বাইব হেঁকে

চলব দেশান্তরে
গান গেয়ে প্রাণ ভরে
তুমি তাই দেখে জ্বলে
জয়ঢাক হও ফুলে!

—কি হিংশুটে ব্যাং! পিছন ফিরে ব্যাঙের ফোলামত মুখটার দিকে চেয়ে কাঠবিড়ালি বলল।

রৌদ্রধারা ঝলমল করে নেমেছিল নদীর ধারে মেহেগনি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে। ছায়া আর রোদ ছড়িয়ে পড়েছে নক্সা কেটে। নদীর জল টুং টাং সেতারে ঘা দিচ্ছে। লালপাতার উপর ফড়িং ভেসে চলেছে স্রোতে আর কিনার ধরে গল্প করতে করতে চলেছে কাঠবিড়ালি। আর আরও পিছনে, —দে! দে আমার পারানির কড়ি—কড়ি দিয়ে দে—বলে থপ্ থপাস্ করে লাফিয়ে আসছে ব্যাং।

ফড়িং বলল,—ভাই কাঠবিড়ালি, আমার নৌকোর হাল একটা কেটে দাওত তোমার শক্ত দাঁত দিয়ে।

কাঠবিড়ালি একটা শক্ত আর মজবুত দেখে ঘাসের কাঠি কেটে ছুঁড়ে দিল ফড়িংকে। ফড়িং খুশি হয়ে হাল ধরে বসল। একটা নতুন গান বেঁধে গলা ছেড়ে দিল সকালের হাওয়ায়। লালপাতার নৌকা ভেসে চলল সত্যিকারের নৌকারই মত।

বাদাম গাছ ছেড়ে বেশ কিছুদূর চলে এসেছে তারা। হঠাৎ কাঠবিড়ালি হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা উঁচু ঢিবির মত কিসে লেগে। ঢিবিটা অবশ্য সত্যিকারের ঢিবি নয়। সেটা ছিল অষ্টাশী বুড়ো শিরোমণি সাংখ্যতীর্থ কচ্ছপ কাব্যবেদান্তের পিঠ। এমন সুন্দর ভোরে কচ্ছপ দাদু রোদ পোয়াচ্ছিল চোখ বুঁজে; আর মনে মনে শোলোক ভাঁজছিল। তন্দ্রা টুটে যেতে খোনা খোনা গলায় বলে উঠল,—কে বাছারা আমায় ডিঙিয়ে যায়? এত ব্যস্ত কেন? ত্বরা কিসের?

কাঠবিড়ালি চট করে পায়ের ধূলো নিয়ে বলল—ফড়িং এই লালপাতার

নৌকো চড়ে দেশ ভ্রমণে চলেছেন। আমি চলেছি ওঁকে এগিয়ে দিতে। আর হিংশুটে কোলাব্যাং পারানির কড়ি মেগে সঙ্গে চলেছেন।

তাই না কি! তাই না কি!—বলল কচ্ছপ দাদু দু-কান অবধি হেসে,—এ তো খুব মজা,—একজন চলেছেন দেশান্তরে, আরজন পারানি চায়! তা তোমার বুঝি নৌকা নেই?

উঁহু! সব ব্যাং খুড়ো কিনে নিয়েছেন। উনি খুব বড়লোক কি না, একটা মস্ত চকচকে আধুলি আছে ওনার। তাই বেজায় অহংকার আর ভারী কেপ্‌পন!

তাতে আর কি হয়েছে!—কচ্ছপ তার গলাটা উঁচু করে বলল,—তুমি আমার পিঠে চড়ে বসো। আমি তোমায় দেশান্তর দেখিয়ে আনব এক্ষুনি।

কাঠবিড়ালির ত খুব মজা। তুড়ুক করে লাফিয়ে সে কচ্ছপ দাদুর পিঠে চড়ে বসল। তারপর কানের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল,—দাদু, ওই যে বললে দেশান্তর, সে কোন তরফে?

কাঠবিড়ালিকে পিঠে নিয়ে জলে নেমে যেতে যেতে গলাটা বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল কচ্ছপ। বলল,—ওই যে, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে! ওই যেখানে চকচক করছে আকাশটা হীরের ডুমোর মত, আর দেবদারুর সবুজ চেলিখান দুলছে হাওয়ায়, ওই চেয়ে দেখ হাঁসরাজারা প্যাখম মেলে নামল চিন্তামণির জলে নাইতে, ওইখানে।

কাঠবিড়ালি চাইল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। সত্যি আকাশটা ঝকমক করছে দূরে। আর দেওদারের গাঢ় পাতা চেলির মতই দুলছে বাতাসে। কিন্তু কোথায় হাঁস রাজারা? তার সন্দেহ হল কাছিমদাদুর চোখে ছানি পড়েছে ঠিক।

ঝপাং! কাছিম জলে নামতেই তরতর করে ছুটল স্রোত দুপাশে। লাল-পাতার পাশাপাশি চলল তারা ভেসে গল্প করতে করতে। ব্যাং যখন দেখল দুজনে মহাস্ফূর্তিতে ভেসে যাচ্ছে, তখন হিংসের জ্বলে পুড়ে ফেঁপে ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠল।

—অ! এবার দল বেঁধে ফাঁকি! বাহাত্তুরে কচ্ছপ, তোর ভীমরতি ধরেছে!

ডেঁপো ফক্কড়গুলোকে আস্‌কারা দিচ্চিস্‌!—কচ্ছপ তীরের দিকে চেয়ে বলল,—তুমি ত দেখি বাপু বড় কোন্দলপ্রিয়! কেন তোমার উনপঞ্চাশটা নৌকার একটায় চড়ে চল না মোদিগের সাথে!

কেন যাব আমি তোমাদের সঙ্গে? আমি আইন ফাঁকি দিই না! বরং কষ্ট করে সাঁতার কাটি।

ইস্‌, বড়ই কষ্ট! কাছিম, কাঠবিড়ালি আর ফড়িং একসঙ্গে বলে উঠল।

তবে রে প্রতারকের দল! এই দেখ আম্মো কি পারি-না-পারি,—বলে লাফিয়ে পড়ল ব্যাং জলে। ছিটকে উঠল জল রূপোর চাদরের মত ছ'হাত। ব্যাং জল থেকে মুখ উঁচিয়ে খুশিতে ভরপুর হয়ে সাঁতরে চলল পাশাপাশি। ফড়িং গেয়ে চলল—

লালপাতা লালপাতা
ডিঙিখানি ভাসিয়ে—



দুই

এমনিতর সুখে আনন্দে আর খুশিতে দিন কাটত কাঠবিড়ালির। সেদিন অবশ্য সে ফিরে এসেছিল একটু পরেই। কারণ নদীর বাঁক ঘুরতেই তা হারিয়ে গেল, দূরে রাঙা-মাটির মস্ত ঢালের মাঝখান দিয়ে কোথায় কে জানে। তাই সে ফিরে এসেছিল পিঠে ল্যাজটি তুলে। ফড়িং যখন তার সবশেষ গানটা গেয়ে ফেলল তখন সেও উড়ে গেল। আর কাছিম দাদু তাদের দিকে ফিরে একমুখ ফোকলা হাসি হেসে ভুস্ করে ডুব দিলেন জলে। সেই যেখানে কালো কালো মস্ত পাথরগুলো গোল হয়ে জটলা করে। আর ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে বক ঠ্যাং তুলে। মাঝে কালো নিথর দহ, যার জল অনেক অনেক গভীর আর তার নীচে আছে নাকি একটা ছোট্ট দরজা। কাছিম দাদু সেখানে গেলে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই বলে সেইখানে কাছিম চোখটি মু:দ বসে থাকে আর মুচকি হাসে। আর না-জানি কি ভাবে। হয়ত রাতে একটা লাল তারার মোমবাতি হাতে করে আকাশে যে পাড়ি দেয় তার কথা।...

আর হিংগুটে ব্যাং? সেও তাইরে নাইরে গাইতে গাইতে সেদিন ফিরে এল তার শ্যাওলা ঘেরা বৈঠক খানায়। ফিরেই দেরাজ টেনে তার আদায়-উশুলের খাতাখানা খুলে বসল। টুকে রাখল লাল কালির বড় বড় হরফে, পারানির কড়ি কে কে ফাঁকি দিয়েছে সেদিন। সাক্ষীর জায়গায় আপনার নামটা পুরো লিখে খাতা ভাঁজ করে তুলে রাখল।

সে'দিন বেজায় খুশি হয়েছিল সবাই। ফিরে এসেও কাঠবিড়ালি ফিরে তাকায় বারে বারে। নদীর হীরে-ঝলসানো বুকে লালপাতাখানা ভাসতে ভাসতে গেল কোথায়? হয় তো,—তার মনে হয়েছিল—সেই সব দেশগুলোর পাশ দিয়ে যার গল্প সে পড়েছে কত। যখন রাত হয়েছিল গভীর—সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—লালপাতা ভেসে যাচ্ছে অনে—ক দূরে, আর সে তার

উপরে বসে। আশ্চর্য এক বন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দুধারে। তার ঘন কালো ছায়া পড়েছে নদীর জলে। লাল পাতার ভেলা ছায়া কালো জলের আয়নায় আপন খেয়ালে ভেসে চলেছে। আশ্চর্য সব জন্তুরা উঁকি দিয়ে দেখছে তাকে। কি সুন্দর তারা দেখতে! কত রঙের রং-বাহার পোষাক তাদের গায়। তাদের চোখগুলো অদ্ভুত সবুজ সোণালী মীনে করা। চোখোচোখি হতেই অমনি সুড়ুৎ করে তারা লুকিয়ে যাচ্ছে ঘন বনের আব্‌ডালে। আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে আশ্চর্য সব ফল। ডালে ডালে আশ্চর্য রঙীন ফুল। ঝুঁটিঅলা মস্ত পাখিরা ঘাড় ফিরিয়ে মিট মিট করে চাইছে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে মুচকি হেসে উঠেছিল সে। ইচ্ছে করছিল পাতার নৌকাখান ভিড়োয় সেই পান্না-সবুজ বন-দেশের কোলটিতে। আর থাকে কিছুদিন সেইসব অজ্ঞাত জীবজন্তুদের মাঝখানে। এই ভেবে পিছন ফিরে কথাটা সে বলতে গেল ফড়িংকে।

কিন্তু কোথায় ফড়িং? তাকে নিয়ে আপনিই ভেসে যাচ্ছে পাতার ভেলা। আর যেন দূরে কোথাও শোনা যাচ্ছিল একটা চাপা গর্জন। তারপর আস্তে আস্তে বনের ছবিটা মুছে গেল। ক্রমশ জোরে ছুটতে লাগল ভেলা। আওয়াজ বেড়ে উঠতে লাগল। যেন হাজার দামামা একসঙ্গে কারা পিটছে। হাজার ভেরী বাজছে। অগুনতি ভারী জানোয়ারদের পায়ের চাপে কেঁপে উঠছে মাটি। জলে ঢেউ দিচ্ছে বিরাট। তার ছোট নদীটি কোথায় হারিয়ে গেছে। পাতার ভেলা হাল-ছাড়া নিরুদ্দেশ সন্‌সন্‌ করে ছুটে চলেছে সেই এক কূল-নেই-যার নদীর তরঙ্গে। প্রকাণ্ড জলের রাশি শুঁড়-তোলা-ঢেউ গর্জে-গর্জে ছুটছে। ফেণায় ফেণায় সিংহের কেশরের মত ফুলে উঠেছে। বাঘের হুংকার দিয়ে আছড়ে পড়ছে। তারপর সেই পাগল জল ঝাঁপিয়ে নামছে কোথাও অতল নীচে।

যেন এবার পাতার ভেলাটা ছুটল তীব্র বেগে সেই জলের ঢালু গড়াই ধরে। নিমেষে কি যেন কি ঘটে যাবে! আতংকে শিউরে উঠল কাঠবিড়ালি! দারুণ ত্রাসে একবার ডাকল সে সেই সকল জানোয়ারদের যিনি দেবতা, সেই অগ্নিময় অংশুমান প্রকাণ্ড গোল, ভোরবেলা যিনি আবিরের গোলা হয়ে ওঠেন প্রত্যহ চিন্তামণির পূবধারে। আর অমনি ঘুম ভেঙে গেল তার।

ভয় থর থর করে কাঁপছিল সে। কিন্তু চোখ মেলে দেখল সে শুয়ে আছে তার পালকের বিছানাটিতেই, জোনাকির প্রদীপ জ্বলছে শিয়র গোড়ায় টিপ টিপ করে। ওঃ স্বপ্ন! কিন্তু বাইরে ও কিসের গভীর আওয়াজ? আকাশ আর মাটি কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। বাদাম গাছটা ভীষণ দোল খাচ্ছে। বিদ্যুৎ ঝলক প্রজাপতি ডানায় কাঁপছে তার কোটরের দেয়ালে প্রতি পলে। বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। শোবার ঘরের ঘুলঘুলির মুখের কবাট সরিয়ে তাকাল বাইরে। আর হুহু হাওয়া পাগলমত এসে লাগল মুখে-চোখে। সে কি দেখল? আকাশ অন্ধকার। তারাগুলো মুছে গেছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ ফেনিয়ে উথলে উঠছে। শব্দ হচ্ছে গুর্ গুর্ গুড়ুম! তার সাথে হাওয়া বাঁশীর মত হেঁকে যাচ্ছে—বাদাম গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে। নুয়ে পড়ছে ডালগুলো মুখ ঢেকে। তারপর নামল বৃষ্টি দারুণ ঝড়ের সুরে সুর মিলিয়ে।

বাইরে বিদ্যুৎ-ভাঙাচোরা আকাশটায় চেয়ে দেখছিল কাঠবিড়ালি। তবে তার স্বপ্ন মিথ্যে নয়। এমনই গর্জন শুনেছিল সে ঘুমের ঘোরে। যখন লাল পাতার ভেলা ছুটে যাচ্ছিল তাকে নিয়ে।…সে রাতে পালকের বিছানায় কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থেকে সে শুনতে লাগল বাইরে হা-হা হাওয়ার ডাক আর মেঘমন্দ্র। কেঁপে উঠতে লাগল তার ছোট বুকটা বারবার। জোনাকি প্রদীপ মিট মিট করে জ্বলতে লাগল।

ভোর হলে কাঠবিড়ালি চাইল জানলা দিয়ে বাইরে। সারারাত বৃষ্টি হাওয়ায় ধুয়ে চারিদিক ঝলমল করেছে। কিন্তু চিন্তামণির কাচের মত জল আজ গেরুয়া রঙে ভরে গেছে। তার মিষ্টি কুলুকুলু গান থেমে গিয়ে একটানা ঝর্-ঝর্ ঝর্-ঝর্ আওয়াজ ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে চিন্তিত মনে কাঠবিড়ালি চা করতে বসল। জলছবি-পাড় দেওয়া চায়ের বাটিতে চা ঢেলে তাক থেকে পেড়ে আনল কয়েকটা বাদাম, যা মধুতে ভেজানো ছিল। সাঁঝবেলায় কুড়িয়ে আনা ঘাস-ফুলগুলো সাজিয়ে রাখল ফুলদানিতে। তারপর চা খেতে বসল। রোদের একটা চওড়া ফলা এসে পড়েছিল তার কোটরের জানলা দিয়ে। চীনেমাটির পেয়ালার কানায় লেগে গোল সোনার হারের

মত সে আলো ঠিকরে পড়েছিল দেয়ালে। সে দিকে চেয়ে চেয়ে কাঠবিড়ালি ভাবতে লাগল গত রাত্তিরের স্বপ্নের কথাটা। কি সুন্দর ঘর তার! কি শান্ত, একলাটি! সকালের আলো যেন মনের কথা হয়ে কানে কানে কথা বলছে ঘরের সাজানো আসবাবগুলোকে। সে কেন এমন স্বপ্ন দেখল? সে ভেবে পেল না। চা খেয়ে উঠে পড়ে গোঁফ জোড়া আর ল্যাজের লোমগুলো খুব মন দিয়ে আঁচড়ে নিল কুটুস কাঁটার বুরুশ দিয়ে। একটা বেশ রঙীন শৌখিন দেখে রুমাল বার করে তাতে একটু ভুঁইচাঁপার আতর ঢালল। ভাল করে সেটা গলায় বেঁধে চলল সে গিরগিটি বন্ধুর বাড়ি।

গিরগিটির বাসা অল্প দূরে, নিমগাছে। দু'পা যেতেই পৌঁছে গেল কাঠবিড়ালি। গুঁড়ি বেয়ে উঠে কড়া নাড়ল দোরে। অমনি কর্তা গিন্নী ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে উঁকি দিল এপাশ ওপাশ থেকে। যখন দেখল যে পাওনাদার নয়—তখন 'আরে এসো এসো' বলে দরজা খুলে দিল। কাঠ-বিড়ালি তাদের ঘরের লোক। সকলে গিয়ে বসল হেঁসেলে।

মস্ত এক কেৎলিতে জল শোঁ-শোঁ সাঁই সাঁই করছিল উনুনের উপর। পেতলের ডেকচিতে একমুঠো কালকাসুঁদির পাতা ফেলে তাতে গরম জল ঢেলে দিল গিরগিটি গিন্নী। তারপর ছোট বড় কানা-ভাঙা বাটিতে চা ঢেলে খেতে দিল সবাইকে।

স্বপ্নের কথাটা কাঠবিড়ালি আগাগোড়া বলল তখন। কি ভাবে সে ভেসে যাচ্ছিল। সেই আশ্চর্য বন আর অদ্ভুত প্রাণীরা, আর সেই গভীর গর্জন। শুনে চুপ হয়ে গেল গিরগিটি কর্তা গিন্নীর হাতের পেয়ালা। চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল ছেলেরা।

—তাইত ভায়া, এ যে ভয়াংকর সাংঘাতিক স্বপন দেখেছ তুমি,—বললে গিরিগিটি।—এ স্বপন মাত্তর একবারই দেখেছিল আমার প্রপিতামহের শ্বশুর মশাই। তখন চিন্তামণির তীরে বাঘ ভালুক আর দু'পেয়ে রাক্ষস চরে বেড়াত। সভ্য প্রাণী মাত্রেই কোটরে লুকিয়ে থাকত দিন রাত। আর আমাদের রাঙা-ঠাকুর দেবতা মোটেই ফিরে চাইতেন না তাঁর সপ্তাশ্ব রথে চেপে যেতে যেতে।

তখন দিন আর রাত বোঝা যেত না ঠিকমত। আর নদী ছিল অঘোর ঘুমে। তাই সবাই মিলে স্তব করল। একদিন তিনি তাকালেন নীচে। যেই তাঁর চকচকে মুখখান দেখা অমনি ভয়ের জন্তুগুলো পিছিয়ে গেল ওই বনটায়।—বুড়ো আঙুল উল্টে দেখিয়ে বলল গিরগিটি।

তারপর?

সেই থেকে আমরা নিরাপদে বাস করছি নদীতীরে। কিন্তু তোমার স্বপন শুনে,—বলতে বলতে হঠাৎ গিরগিটির মুখটা লাল হয়ে উঠে এক্কেবারে সাদা হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল,—গিন্নী শিগ্‌গির আমার ওষুধের বাক্স আন। আমার মনটা কেমন ধাপুস্ ধুপুস্ করছে—!

ওমা কি হল গো!—ছুটে গেল গিন্নী ওষুধ আনতে। কাঠবিড়ালি অস্থির হয়ে উঠল। দেখ কাণ্ড, স্বপ্ন দেখেছে সে আর ধাপুস ধুপুস করছে অন্য লোকের মন!

ওষুধের বাক্স এলে গিরগিটি চোখে চশমা এঁটে দু তিনটে বড়ি গালে ফেলে দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। কাঠবিড়ালি ডাকল—

গিরগিটি মশাই!—অমনি চোখ পাকিয়ে তাকাল গিরগিটি গিন্নী। ভয়ে চুপ করে রইল বেচারী। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে থাকার পর বলতে শুরু করল গিরগিটি ধীরে ধীরে,—এ স্বপন ত ভায়া হালে কেউ দেখেনি! এর অর্থ হল, বলে চোখ বুঁজে তার মনের ভিতর চেয়ে বলল গিরগিটি—এখন তোমার বাদাম গাছে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আমি যেন পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার বাদাম গাছের দিকে চেয়ে ছুটে আসছে ইয়া ইয়া হোঁৎকা প্রাণী সব। তারা শিং-অলা দাঁতলা নখলা ভয়ংকর ভিরকুটি করা জানোয়ার। দাঁত কড় মড় করছে ওদের—ডাক ছেড়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে আসছে।...

থর থর করে কেঁপে বলল কাঠবিড়ালি,—কিন্তু তারা আমারই বাদাম গাছটার দিকে আসছে কেন গিরগিটি মশাই? আপনার নিম গাছটা ত আগেই চোখে পড়ে!

—বালাই যাট! কি অলক্ষুণে কথাগো! কচিকাচা নিয়ে ঘর করি, বলে

কিনা আমার ঘরে আসছে না কেন!—চেঁচিয়ে তিরস্কার করে বলল গিরগিটি গিন্নী।

তোমার গাছটায়ই ওদের নজর—কারণ তুমিই স্বপন দেখেছ। বললে গিরগিটি।

বাঃ! তাতে এমন কি দোষ হয়েছে?

হয়েছে। বিলক্ষণ হয়েছে! স্বপন দেখা ওরা সইতে পারে না। ওরা থাকে বনের আবডালে। আঁধারে ঘোরাঘুরি করে। ওদের পেল্লায় প্রতাপ। স্বপন দেখলেই ওরা জেনে যায়। কারণ ওদের আঁধার আবডালটা কিলবিল করে ওঠে স্বপনের আলো লেগে। যেমনটি তুমি দেখেছ। তাই ছুটে আসে ওরা মুখ ব্যাদান করে। স্বপন দেখুয়েদের ল্যাজে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায়···

কি সাংঘাতিক!! গিরগিটি, তার গিন্নী, আর কাঠবিড়ালি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। আবার গিরগিটি তার মনের ভিতর চেয়ে থেকে বলল,—তারা এবার বাদাম গাছটা দেখতে পেয়েছে। ভীষণ সোরগোল উঠেছে ওদের মধ্যে। সবাই হাঁ করছে এক একটা···উঃ কি বিরাট ওদের হাঁ···যেন জগৎব্রহ্মাণ্ড গিলে ফেলবে—

থাক! থাক! আর দেখবেন না অমন চোখটি বুঁজে গিরগিটি মশাই! আতঙ্কে বলে উঠল কাঠবিড়ালি।

চুপ করো! ফুঁপিয়ে উঠল গিরগিটি গিন্নী।

কি মজা! হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেরা।

গিরগিটি চোখ মেলে তাকাল,—তাহলে ভায়া তুমি এখন তৈরী হও এক প্রকাণ্ড যাত্রার জন্যে। ওই যে বন দেখছ,—বলে চিন্তামণির তীর থেকে যে পর্দার মত ঘন সবুজ বনটা টানা সেদিকে দেখিয়ে বলল,—ওই অজগর বনের মধ্যে তুমি চলে যাবে। ওই বনে পথ কোথাও নেই। একটু ঢুকলেই তুমি হারিয়ে যাবে। যে দিকে তাকাবে দেখবে ডাইনীর জটার মত কেবল গাছ আর গাছ। সূর্য চন্দ্র তারারা চায় না সেখানে। আছে শুধু আঁধার। আর আছে ভীষণ বন্য প্রাণীরা, আমাদের মত নিরীহ জীবদের দেখতে পেলেই কপ্ কপ্ করে ধরে খায়।

কাঠবিড়ালির চোখ ছুটো পাথরের ঢেলার মত চেয়ে ছিল। সরু গলায় বলল সে—আমার তা'লে বিষম ভয় করবে যে!

ওখানে তুমি এমন বিকট ভয় দেখতে পাবে যে সব ভয়ই ঘুচে যাবে।

ও ব্বাবা! আমি তা হলে যাবই না!

গিরগিটি থমথমে মুখে চাইল,—ওরা তাহলে তোমায় ধরে নিয়ে যাবে।

শুনে কাঠবিড়ালির গায়ের সবকটা রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল। বলল,—গিরগিটি মশাই! আপন বাসা ছেড়ে কোথায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াব?

ওই বনে!—বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল গিরগিটি,—সমস্ত ভয়ের বনটা পেরিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় হলে পরেই তোমার যাত্রা শেষ হবে। তখন আবার আসবে।

শুনে মনের ছঃখে ফিরে এল কাঠবিড়ালি তার কোটরে।

আরাম কেদারায় শুয়ে হাতের মুঠোয় গাল রেখে ভাবছিল কাঠবিড়ালি। তাকে যেতে হবে। এই সুন্দর বাসা ছেড়ে ওই গহিন বনে। তাকে জানতে যেতে হবে। কেন? তা সে ভেবে পেল না। তবু তাকেই জানতে হবে। নইলে বিকট সব ভয় ছুটে আসবে, তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।



সারাদিন সে আর বার হল না। ঘরের মধ্যে বসে চেয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় আকাশের ঢলে পড়া আলো মেঘের কুঁড়িগুলোয় কমলা রং মাখিয়ে দিল। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নরম থাবা ফেলে চুপিসাড়ে এসে বসল তার পাশে। উঠে পড়ে সে ঢুকলো তার ভাঁড়ার ঘরে। কত কি সে জমিয়ে রেখেছে। রঙীন মাটির

পাত্রে পাকা লাল লাল বাদাম। কত রকমারী আচার। বসন্তকালে এনেছিল ও-পাড়ার মৌচাকিদের কাছ থেকে চোঙা-ভরা মধু। বনের কিনারা থেকে বৈঁচি এনে মালা করে গেঁথে রেখেছিল। শীতকালে সাঁঝ পেরোলে সে একটা বাতি জ্বেলে আরাম কেদারায় বসে। এক প্লেট খাবার আর একটা মস্ত কেতাব পেড়ে নেয়, যার ধারটা সোনার জল ছোবানো। গল্প পড়তে পড়তে সে হারিয়ে যায়। কত, কত রাত তার খেয়াল থাকে না।

সে রাতে ঘুমল না সে। গোছগাছ করতে লাগল। একটা সুন্দর ঝোলা নিল। তার মধ্যে ভরে নিল লাল সবচেয়ে পাকা বাদামগুলো বেছে বেছে। আর নিল ছোট একশিশি মধু। কুটুশ কাঁটার বুরুশটা নিল গায়ের বাহারে লোম পাট করতে। একশিশি সর্বরোগহরা ওষুধ নিতে ভুলল না। কাঠবিড়ালিদের একজন মস্ত কবিয়ালের একটা কবিতার বই নিল। সবশেষে নিল ঈগল পাখীর বাঁকানো নখের একটা ছুরী, হাতলটা তার রূপোর কাজ করা। সেটা কোমরে ঝোলাল। আর মাথায় পরে নিল মাছরাঙ্গার রঙীন পালক লাগানো বাহারে টুপি। পায়ে দিল বুট। সাজ-গোজ সাঙ্গ হলে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা দেখে নিল। তারপর আরাম কেদারায় শুয়ে বাকি রাতটুকু গভীর চিন্তায় ডুবে কাটাল।

সবে যখন দিনমণি মুখ তুলেছেন, তাঁর রাঙা উষ্ণীষের দিকে চেয়ে কাঠবিড়ালি ভক্তিভরে প্রণাম করল। রাত্তিরে ধরে আনা জোনাকিটা ছেড়ে দিল নদীর ধারে। বললে তার কানে কানে—আমি আবার ফিরে এলেই তোমাকে নিয়ে আসব! তারপর শোবার ঘরের ঘুলঘুলি বন্ধ করে কোটরের দরজায় একটা প্রকাণ্ড তালা ঝুলিয়ে দিল। দরজার গায় খড়িমাটি দিয়ে লিখল।—

শ্রীকাঠবিড়ালি দেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেক—অনেক—
দিন পরে ফিরিবেন।

সিঁড়িটা বাদামগাছের অন্য এক কোটরে লুকিয়ে রেখে তরতর করে নেমে এল সে গুঁড়ি বেয়ে। তখন আলোয় ভরে গেছে দেশ। চিন্তামণির

তীরে খসখসের সারি দুলছিল হাওয়ায়। আলোর তীরগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছিল পিছনের গভীর বনটার দিকে আর হারিয়ে যাচ্ছিল।

বাদামগাছের নীচে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল তার বাসার কুলুপ ঝোলান দরজাটার দিকে। তারপর তাকাল চিন্তামণি নদীর দিকে। চিন্তামণির বুক আজ স্বচ্ছ, জল তরতরিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে কুলুকুলু। নদী তার না-থামা-গান গেয়ে চলেছে। ভোরের গন্ধ-মাখা হাওয়া আসছে ঘাসের চিকন মাথাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বাদামের পাতা কাঁপছে মৃদু মৃদু। দুধারে সোনার বালিরেখা চলে গেছে দূরে—অনেক দূরে।—কাঠবিড়ালির চোখে জল এল। সে ফিরে চাইল বনের দুর্গম পর্দাটার দিকে। তারপর পা বাড়াল যাত্রার।

দুপা সবে গেছে। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বিদ্রূপ করে হেসে উঠল।

হ্যা! হ্যা! বলি সকাল বেলা তালপাতার সেপাই সেজে বাবুটি চলেছে কোথায়?

গাছের গোড়ায় একটা মস্ত শিকড়ে বসে কোলাব্যাং হাসছিল এ কান থেকে ও কান। ভীষণ খারাপ লাগল কাঠবিড়ালির। বললে,—আমি কোথায় যাচ্ছি তাতে আপনার প্রয়োজন?

প্রয়োজন কি সাধে? হুঁহুঁ, জানতো বাবা আমি হলেম সব মৎলব ফাঁস সর্বঘটে ঘটি তারকেশ্বর কোলাব্যাং! আমায় ফাঁকি দেবা তুমি?

কাঠবিড়ালির মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। বললে আড়চোখে তাকিয়ে।—

যাচ্ছি মস্তসরোবরের সোনাব্যাং মেসোমশাইর কাছে। তাঁকে খবর দিতে যে কোলাব্যাং কাকা কল্পতরু হবেন! তাই যেন সকলকে জানানো হয়!

এ্যাঁ! এ্যাঁ! কি বললি? ওরেরে পাষণ্ড বেয়াদপ ফন্দীবাজ! খবরদার, সোনাব্যাঙের কাছে মিথ্যে রটাবি ত কেটে ফেল দোব! ধর ধর পাজী ছুঁচোটাকে...! রেগে ফুলে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে থপথপিয়ে তেড়ে এল কোলাব্যাং।

কিন্তু কাঠবিড়ালি তখন হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে গেছে অনেক দূর। কোলাব্যাং সোনাব্যাংকে অপছন্দ করে বেজায়। অনেক দূরে চলে যাওয়ার পরও কাঠবিড়ালি শুনতে পাচ্ছিল,—খবরদার! ভাল হবেনা মিছে কথা বললে,—আমার ঘরে এক রতি সোনা নেই। সব যজমানদের সিঁদুকে। ওপাড়ায় খবর দিলে খুন করব রাস্কেল!



তিন

এগিয়ে চলেছে কাঠবিড়ালি। বেজায় মন কেমন করছিল তার। কেবল পিছন ফিরে দেখছিল বাদামগাছের লালপাতার চূড়োটা আকাশের দিকে জেগে রয়েছে। মাঝে মাঝে গাছের আড়াল সরে সরে ঝিকমিক করে উঠছিল চিন্তামণির জল, যেন একটা সেতার থেমে থেমে বাজছিল। শেষে অনেক অনেক গাছের ভীড়ে কখন ডুব দিল তার বাদামগাছের চূড়ো। আর নদীটি। আর খুঁজে পেল না। চমকে তাকিয়ে দেখল কাঠবিড়ালি, সে এসে পড়েছে বনের ভিতর অনেক দূর। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে গাছ আর গাছ, গাছের পিছনে গাছ। সবাই স্থির হয়ে একমনে দেখছে তাকে। এ কে চলেছে তাদের নীচে দিয়ে! কোথায়? কেন? হুঁ? এতক্ষণ নদী তাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া,—তার মনে হচ্ছিল এ এক লুকোচুরী খেলা, খুব মজার! কিন্তু যখন আর দেখা পাওয়া গেল না, সে জানল নদী আর দেখা দেবে না। সে উপর দিকে তাকাল। গাছের মাথাগুলো জুড়ে গেছে অনেক উর্ধ্বে। নীল আকাশের গা পাতার জাফরি কাটা। সামনে চাইল, কোন পথ আছে কি না। কিন্তু কোথায় পথ? শুকনো পাতা বিছানো বনের মেঝে। তার ওপর রোদের ছোট বড় দাগ আঁকা। এখন কোন দিকে যাবে সে?



কথাটা ভাবতে ভাবতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে দিকেই যাবে এগিয়ে

আসবে বন। কেবল গভীর থেকে আরও গভীর বনে ঢুকবে। কিন্তু ফুরোবে না, কারণ সে শুনেছিল বনের শেষ নেই কোথাও। সারাদিন হেঁটে যখন সন্ধ্যে হবে, তখন সে তার চিন্তামণির তীর থেকে অনেক দূরে। তারপর নামবে রাত। ভাবতেই মনটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। কোথায় থাকবে? কোথায় ঘুমোবে? সে যে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে কথাটা একেবারেই উবে গেল মন থেকে। ঘরকুনো জীব সে। একখানা ঘর না পেলে তার কিছুতেই চলবে না। তাই প্রথম কাজ এই গহিন বনে একটা কোটর খুঁজে বার করতে হবে। সেখানে রাতে থাকবে। দিনের বেলা দেশভ্রমণ করলেই হবে। আর জ্ঞান সঞ্চয় করবে। আবার গুটি গুটি এগিয়ে চলল কাঠবিড়ালি গাছগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! এতখন চলেও একটিও প্রাণীর সে সাক্ষাৎ পায় নি। মনে মনে অনুমান করল,—এমন জায়গায় কোন সভ্য জীবই বাস করে না! অমনি চোখে পড়ল—এক ছোট্ট শুঁয়োপোকা রোঁয়া ফুলিয়ে পার হচ্ছে সামনে দিয়ে। দৌড়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল কাঠবিড়ালি।

শোঁপোকা ভাই—একটু থামো—একটা কথা বলবে আমায়?

প্রশ্ন শুনে গম্ভীর ভাবে শুঁয়োপোকা দেখল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বলল,—তুমিত দেখছি কাঠবিড়ালি। তা এখানে কি কারণে এসেছ? এখানে ত কাঠবিড়ালিরা আসে না?

আমি দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। আমায় একটা পথ বাৎলে দাওনা ভাই?

পথ?—অবাক হয়ে চাইল শুঁয়োপোকা,—সবখানেই ত পথ এখানে! যে দিকে খুশি গেলেই চলে—

না না—সেই পথটা বল, যা দিয়ে গেলে একটা সুন্দর বাসা মিলবে, নয়ত একটা মুসাফিরখানা।

সুন্দর বাসা?

হ্যাঁ হ্যাঁ—!

শুঁয়োপোকা এক হাত দিয়ে থুত্‌নী চেপে ধরে ভাবতে লাগল। কাঠ-বিড়ালি কথাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য বলল,—এই ধরো এমন বাসা

যার চারপাশে দেয়াল আর মাথায় ছাদ আছে,—হাত বাড়ালেই মিষ্টি ফল পেড়ে নেওয়া যায় ডাল থেকে—

বুঝেছি! দস্তানা! দস্-তা-না! কেমন কিনা? হুঁ হুঁ আমি খুব হেঁয়ালির উত্তর করতে পারি! জানো না তো আমি কি বুদ্ধিমান!—বলে খুশিতে শুঁয়োপোকা এক আঙুল ভর উঁচু হয়ে উঠল।



বাড়ি! বাড়ি—যেখানে প্রাণীজনে বাস করে—বুঝলে?—চেঁচিয়ে বলল কাঠবিড়ালি।

ত্ তা তো বলতে পারব না! তুমি বরং হনুদাদুকে জিজ্ঞাসা করো।

কিন্তু তাঁর ঠিকানা যে জানি না—?

শুঁয়োপোকা তখন তার মুখের একটা লম্বা শুঁড় দিয়ে দেখিয়ে বলল,—ওই সো—জা চলে যাও। যেতে যেতে দেখবে এক জায়গায় খুব মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করছে। অমনি জিভে জল আসবে তোমার আর বুঝবে ঠিক হনুদের পল্লী পৌঁছেচ। তখন যদি এদিক ওদিক চাইতে থাক অমনি হনুদা তেড়ে আসবে!

এ্যাঁ! তা হলে কি হবে! ভয় পেয়ে বলল কাঠবিড়ালি।

—অতশত বলতে পারব না বাপু! বলে শুঁয়োপোকা ডিঙি মারতে মারতে পাতার আড়ালে লুকিয়ে গেল।

কাঠবিড়ালি ভয় ভয় তার দেখানো পথ ধরে এগোতে লাগল। অনেকক্ষণ হেঁটে চলল সে। কখনো মাটির ওপর দিয়ে, কখনো গাছের ডালে ডালে, কখন একটা লতার ঝুলন্ত কাছি ধরে টুপ করে নেমে পড়ে। সারা বন-পথে শুকনো পাতা বিছানো। রোদের ঝিকিমিকি দাগ বনের মেঝেয় কুমীরের মত এঁকে

বেঁকে শুয়ে। আর মাঝে মাঝে ঝর-ঝর আওয়াজে ভরে ওঠে যখন হঠাৎ হাওয়া বয়ে আসে। অমনি রাশি রাশি ঝরে পড়ে শুকনো পাতা, তারপর আবার থেমে যায়। তখন কাঠবিড়ালি চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় কারা চার পাশে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ কথা বলে ওঠে। আবার চুপটি করে থাকে। তার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে। তাকে চমকে দিয়ে রাশি রাশি ঝরাপাতা ছুঁড়ে দেয়।

মাঝে মাঝে সে দেখছিল মুখ তুলে সূর্য কোথায়। সে বেরিয়েছে কোন ভোরে। যখন মনে হল ঠিক দুপুর বেলা, একটা পরিষ্কার দেখে উঁচু শেকড়ের ওপর সে বসল বিশ্রাম করতে। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, চন্‌চনে খিদে পেয়েছে তার ওপর। ঝোলাটা খুলে একটা বাদাম বার করল সে। তাতে একটু তেঁতুল পাতার আচার আর নূন মাখিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কি মিষ্টি বাদামটা! একটা খেয়ে আরেকটা মুখে ফেলতে যাবে, এমন সময়—

সমুখে একটা মস্ত গাছের গুঁড়ি উঠেছিল কত হাত তা কেউ জানে না। সারা গায় তার সবুজ শ্যাওলার দাগ। যেন কোন রূপকথার দুর্গের উঁচু পাঁচিল, বা অন্য কিছু। আর গুঁড়িটার পিছন থেকে জেগে উঠল হঠাৎ একটা—

মস্তো— !

—মস্তো একটা কালো কুচকুচে মুখ! গুঁড়ির আড়াল থেকে সটাং তাকিয়ে দেখছে তাকে। গোল থালার মত মুখটা। নাক চোখ কান কিছু বোঝা যায় না। কাঠবিড়ালি কাঠ হয়ে রইল। হাঁ করা মুখ বন্ধ করতে ভুলে গেল সে। একটু পরে সেই কালো মুখ দুপাটি সাদা চোখা চোখা দাঁতের পাটি খুলে ভেংচি কাটল তার দিকে চেয়ে।

কে এ? কী চায়?

হঠাৎ ভীষণ জোরে ফিস্ ফিস্ করে বলল কালোমুখ—এই!! কি খাচ্ছিস্?

বাদাম! আড়ষ্ট গলায় উত্তর দিল কাঠবিড়ালি।

দে একটা!—

কাঁপতে কাঁপতে একটা বাদাম বার করে হাত বাড়িয়ে ধরল সে। অমনি ফস্ করে একটা হলদে রোমে ভরা আঁকশির মত হাত সেটা ছিনিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

ইস্! কী অসভ্য! কালো মুখ তখন বাদামটা কচমচ করে চিবোচ্ছে। কিন্তু কে ওই…? বাদামটা শেষ করেই কালো মুখ আবার কথা কইল। এবার আরো জোরে ফিসফিসিয়ে।

ফলটা খুব মিষ্টি খেতে।

কাঠবিড়ালি ঘাড় নাড়ল।

আমার খুব ভাল লেগেছে খেতে!

সে আবার ঘাড় নাড়ল।

আমার খুব ইচ্ছে করছে খেতে!

বিরক্ত হয়ে কাঠবিড়ালি অন্য দিকে তাকাল।

দে একটা!—খ্যাক্ করে ধমকে উঠল কুচকুচে মুখ।

আপনি কে? উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি। সে বাস্তবিকই বিরক্ত হয়েছিল।

—আগে দে তবে বোলবো।—চোখ পাকিয়ে বলল অন্যজন। অগত্যা কি করে আর কাঠবিড়ালি? আরেকটা বাদাম বার করে ছুঁড়ে দিল। নিমেষে সেটা গালে পুরে দিয়ে যে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে, সে এক মস্ত হনুমান। গুণ্ডার মত দেখতে। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা।



কানে এক জোড়া পিতলের মাকড়ি—কুস্তিগিরের মত শরীরে-ল্যাজে দশাসই মূর্তি।

—আমি কেটা তা জানিস্? বললে সে কোমরে হাত রেখে।

কাঠবিড়ালি ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে তা জানে না। তখন সেই ব্যক্তি এক হাত কোমরে আরেক হাত মাথার ওপর তুলে জাগাই মাধাই কেতায় নাচ জুড়ে দিল, আর বিশ্রী গলায় গাইতে লাগল—

(আমি) রসুলপুরের হনুমান
(আমার) নেই জুড়ি কোই পলোয়ান
এসো কুস্তিমে, এসো বক্সিংএ
চিৎ করে দোব এক ল্যাংএ
যে হও যতই জাঁহাবাজ
জানো না যতই কূটপ্যাঁচ
পারবে না মোর বিক্রমে
গো-হারান হতে হবে রণে।

ছিঃ! ছিঃ! কী বেজায় অসভ্য! লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নীচু করে রইল কাঠবিড়ালি। চাইতে পারছিল না সেই বিশ্রী নাচের দিকে। হঠাৎ হনু নাচ থামিয়ে বলল,—এইরে—আমি পালাই! ওই যে ওস্তাদের গলা শোনা যাচ্ছে। দেখতে পেলে চাঁটিয়ে মাথায় টাক পাড়িয়ে দেবে!

কে ওস্তাদ?—ভাবল কাঠবিড়ালি। একটু আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল—আজ্ঞে কে তিনি যাঁর নাম করছেন?

শুনে হনুমান এমন ভাবে চাইল যেন সে দেখছে এক বে-হেড্ উজবুককে। ভীষণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—জানিস্ না? তবে ওই শোন্!

কাঠবিড়ালি শুনল। যেন একটা বন-কাঁপানো আওয়াজ এগিয়ে আসছে—উপ্! উপ্!

ভয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে বলল—উনি?

হ্যাঁ! উনিই!! জবাব দিল হনু।—উনিই সারা হনুমন্তপুরের ওস্তাদ বীর বজ্রাঙ্গবলী ব্যোমকেশ বাহাদুর রাজাধিরাজ হাজার-কুস্তির-প্যাচ-রপ্ত অযোধ্যানাথ!

ওরে ব্বাপরে! এতগুলো খেতাব শুনে চোখ সুপুরীর মত হয়ে উঠল

কাঠবিড়ালির। উপ্ উপ্ আওয়াজ তখন আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দাপাদাপি মড় মড় ডালভাঙার শব্দ শুনতে পেল তারা। ছটফট করে হনু পালাবার উদ্যোগ করতেই কাঠবিড়ালি তার পথ জোড়া করে দাঁড়াল। বলল—শুনুন, ও মশাই শুনুন—আমার কথাটা বলা হয় নি যে। আমায় একটা সুন্দর বাসা বলে দিন, যেখানে মিষ্টি মিষ্টি ফল পাওয়া যায়, আর মিষ্টি জল, আর একটা—

লাফ দিয়ে একটা ডাল ধরে উঠে গিয়ে হনু বলল,—ওরে ছোঁড়া পালা শীগ্‌গির এখান থেকে! ওস্তাদ দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না তোর,—তোর বাসা ফলটল সব শুদ্ধু চটকে মিহিদানা করে ফেলবে, ফেলবে ওস্তাদ! বলে আর বাক্যব্যয় না করে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর।

আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে মড় মড় করে ডালপালা সরিয়ে উপ্ করে লাফিয়ে পড়ল একজন পাহাড়ের মত মস্ত বাঁদোর। ভীষণ ষণ্ডা চেহারা, মুখ হাঁড়ির মত, দুচোখ লাল করমচা আর এক একটা দাঁত কুড়ুলের ফলার মত। কাঠবিড়ালিকে সামনে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

—এটা! এটা আবার কে?—কর্কশ গলায় হাঁকল সে। একটু থেমে আবার বলল—হুঁ?

কাঠবিড়ালি বুঝল এই ওস্তাদ। উঠে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব ভদ্রজনোচিত কেতায় সে একটু মিষ্টি হাসল। কিন্তু অন্যজন তেমনিই ভুরু কুঁচকে রুক্ষভাবে কটমটিয়ে চাইতে লাগল। পিছন দিকে গাছের আড়াল থেকে আরও একটা হনুমান বেরিয়ে এল আর কুস্তিগিরের ভঙ্গীতে বুকের ওপর দুহাত ভেঁজে দাঁড়াল ওস্তাদের পাশে। সে সম্ভবত ওস্তাদের উপমন্ত্রী, ভাবল কাঠবিড়ালি। কিন্তু সে যে কোন দেশের জীব ঠাওর করতে না পেরে পরস্পরের মুখচাওয়া-চায়ি করতে লাগল ওস্তাদ আর উপমন্ত্রী।

কোত্থেকে এল এ?—বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল ওস্তাদ। অন্যজন একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে খুব ভাল করে দেখল কাঠবিড়ালিকে।

—সাহেব, একে ত দেখে মনে হচ্চে না যে এ আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা। বোধহয় শত্রুপক্ষের চর।

চর ? চোখ পিট পিট করে চাইল ওস্তাদ।

তাইত মনে হয় ! জবাব দিল উপমন্ত্রী।

কড়মড় করে খেয়ে ফেলে দাও !

আদেশ শুনে হাত পা পেটে সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম কাঠবিড়ালির। কাঁপতে কাঁপতে সে বলল—আজ্ঞে আমি চর নই মশাই। আমি চিন্তামণি নদীতীরের কাঠাবিড়ালি বাদাম গাছের বাসিন্দা। পরশু রাত্তিরে একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখেছিলাম। তাই আমায় জ্ঞান সঞ্চয় করবার জন্য দেশভ্রমণে যেতে বললো গিরগিটি। তাই—

ভীষণ বিদঘুটে তাকাতে লাগল ওস্তাদ। কাঠবিড়ালির কথাগুলো আপনা হতেই থেমে গেল।

—বেটা বেজায় ধূর্ত ! তা বাদাম গাছ থেকে যখন এসেছিস্ তখন নিশ্চয়ই তোর কাছে বাদাম আছে !—রহস্য করে হাসল ওস্তাদ উপমন্ত্রীর দিকে আড়চোখে চেয়ে।

কাঠবিড়ালি ভয় ভয় বলল—হ্যাঁ।

দে একটা !

কাঠবিড়ালি একটা বাদাম বের করে ওস্তাদের হাতে দিল। অমনি সেটা গালে ফেলে কচোর কচোর করে খেতে শুরু করল ওস্তাদ। উপমন্ত্রী এতক্ষণ একদৃষ্টে ওস্তাদের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। তাকে খেতে না দেখে তড়াক করে সামনে এসে একটা মস্ত থা'বা পেতে ধরল,—আম্মো একটা খাব তা'লে !

সেও একটা খেল। কাঠবিড়ালি বিরক্ত হয়ে ভাবল কি অসভ্য এ মুলুকের সকলে। খালি অন্যেরটা খেতে চায়। নাঃ এখানে আর থাকা নয়। এখন সরে পড়তে পারলে বাঁচা যায়।

ওস্তাদ চোখ বুঁজে খাচ্ছিল বাদামটা। এমন মিষ্টি বাদাম সে জীবনেও খায়নি। যতই মুখের মধ্যে বাদামের কুচোগুলো মচ মচ করে ভাঙে ততই সে

ভাবে। এখন ওস্তাদ হল সবার সেরা বুদ্ধিমান। তাই না তাকে সারা হনুমন্তপুরের ওস্তাদ করেছিল। হঠাৎ চোখ মেলে সে কাঠবিড়ালির দিকে ফিরে বলল ভারী মিষ্টি গলায়,—বল্‌ত বাছা তোর বাদাম গাছটা পূবদিকে না পশ্চিমে ?

এখন কাঠবিড়ালি ভোর থেকে বরাবর পশ্চিম মুখোই হেঁটে চলেছিল। কিন্তু সে তা বলল না।

—আজ্ঞে সোজা পশ্চিমে গেলেই বাদাম গাছটা দেখতে পাবেন।—বললে সে। অমনি বুদ্ধিমান হনুদের ওস্তাদ লাফিয়ে উঠে বলল—উপ্‌! ডাকো প্রজাদের! উপ্‌! উপ্‌! প্রচার করো চতুর্দিকে যে হনুদের বীর ওস্তাদ পশ্চিম বনে আবিষ্কার করেছেন এক মহৎ বাদাম ফলের বৃক্ষ। চল সকলে পশ্চিমে—সো—জা পশ্চিমে! গাছটা মুড়িয়ে খাইগে ভাই সকল!

অমনি উপ্‌ আপ্‌ শব্দে ভরে উঠল চারিদিক। চারিদিক থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল অসংখ্য মুখপোড়া হনুমান। দল বেঁধে এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে ছুটল তারা পশ্চিম মুখো।—

চার

বাপ্‌রে বাপ! উঃ কি বিপদে পড়া গিয়েছিল!—বলল কাঠবিড়ালি হাঁফ ছেড়ে।

উপ্‌ উপ্‌ করে বন কাঁপিয়ে হনুরা বিদেয় হল। চারি পাশে তাকাল কাঠবিড়ালি। গাছের চূড়োয় চূড়োয় হলুদ রং লেগেছে। এই বার দিন অস্তে নামছে। তারপর ঘনিয়ে আসবে অন্ধকার। হঠাৎ কাঠবিড়ালি চমকে ভাবল—রাতে বিশ্রামের কোন জায়গাই ত খুঁজে পায়নি সে এখনও। কোথায় থাকবে সে? কোথায় সেই সব মিষ্টি ফলের গাছ যা শেঁাপোকা বলেছিল? কোথায় বা এ দেশের জনপ্রাণী সব? পথটা কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবে নাকি? কিন্তু কাকে?

হঠাৎ লুকোনো পাতার আড়াল থেকে এক জন ঝিঁঝি পোকা সাঁঝের বাসরে সানাই বাজাতে শুরু করল। অমনি বনটা সরগরম হয়ে উঠল। কাদের গলার আওয়াজ এখানে ওখানে শোনা যেতে লাগল। ভাবল সে—তাইত, বনে দেখছি সাঁঝের বেলা সকলে জেগে ওঠে। কিন্তু সে সাঁঝ হলেই বাড়ি ফেরে, ঘুমোয়। বাসা তার একটা চাই। আর এখুনি চাই। আচ্ছা ঝিঁঝি পোকাটার পরামর্শ নিলে হয় না? সে তাকাল আশে পাশে।

ঝিঁ—ঝি—ই! ঝিঁ—ঝি—ই! শব্দ আসছে। কিন্তু কোথায়?

—ঝিঁঝিপোকা—ও ঝিঁঝিপোকা! ডাকল কাঠবিড়ালি। কিন্তু এত গোলমালে সে নিজের গলাই শুনতে পেল না। একটা অন্ধকার ডালের গা থেকে আওয়াজটা খুব জোরে আসছিল। গাছে চড়েই না হয় দেখা যাক। কাঠবিড়ালি গুঁড়ি বেয়ে উঠে এগিয়ে গেল। অমনি আওয়াজটা থেমে গেল।

তাইত! কোথায় হে? কই হে?

কানের কাছ থেকে কে ফিস্‌ ফিস্‌ করে চেঁচিয়ে বলল—এই যে আমি—দেখতে পাচ্ছ না?

ভীষণ চমকে তাকাল স্বরের দিকে কাঠবিড়ালি। আবার শুনতে পেল, —কি চাও? কে বট?

দেশলাইয়ের বাক্সের মত চৌকোপানা ক্ষুদ্র এক জীব ড্যাবডেবিয়ে দেখছিল একটু উপর থেকে তাকে।

কে বট?

আমি কাঠবিড়ালি!

আমি ঝিঁঝিট রাগিনী মক্ত ঝিঁঝি পোকা।

এঁ্যা!

চমকে উঠলে?

ভীষণ!

চমকোনা। আমি আর যে সব রাগ রাগিনী জানি তার নাম শুনলে তোমার পিলে চমকে যাবে।

পিলে চমকানোর ইচ্ছা ছিল না কাঠবিড়ালির। তবু ভদ্রতা করে বলল,— তাই বুঝি? খুব মজার ত!

—হ্যাঁ। এই যেমন ধর, ঘটোৎকচ রাগিনী, হিড়িম্বা রাগিনী, বকাসুর রাগ আর সূর্পনখা তেলেনা।

—কী সাংঘাতিক! রীতিমত অভিভূত হয়ে বলল কাঠবিড়ালি।

ধামার কয় মাত্রা জানো? শাস্তরে বলে চোদ্দ,—বলে গলা নামিয়ে বলল, আমি কিন্তু সাড়ে চোদ্দয় গেয়ে দি! কেউ ধরতে পারে না! হিহি—! আচ্ছা একটা গিটকিরি শোনো তা'লে আমার গলায়—

না! না!—ভয় পেয়ে বলে উঠল কাঠবিড়ালি।

বেশ। তা যদি না শুনতে চাও একটা হলক তান শোনো আপাতত। এতে আপত্তি নেই ত?—বলে আপত্তির সুযোগ না দিয়েই ঝিঁঝি পোকা—

ও আও ওআও হি হি
ও আও ওআও হি হি

করে একরকম আওয়াজ করতে লাগল।

হয়েছে! হয়েছে! বেশ! বেশ! চেঁচিয়ে বলল কাঠবিড়ালি। ইস্! কি পাগলের পাল্লায় পড়া গেল যা হোক্! বিব্রত হয়ে ভাবল সে। ঝিঁঝি পোকা খুশি হয়ে গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করল,—তা তুমি কোথায় যাচ্ছিলে চারি দিকে অমন চেয়ে চেয়ে?

কাঠবিড়ালি তখন তাকে তার বাসার প্রয়োজন আর দেশ ভ্রমণের কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে বলল—রাতে একটা ঘুমোবার ঠাঁই মেলে কিনা তাই চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

রাত্তিরে আবার কেউ ঘুমোয় নাকি?—অবাক হয়ে বলল ঝিঁঝি পোকা।

তবে কি করে?

গান গায়!

বুঝতে পারল না কাঠবিড়ালি। ঝিঁঝি পোকা বুঝিয়ে বলল—বুঝলে না? রাত্তির হলেই আমরা বনের প্রাণীরা দেদার গান গাই। শেয়াল গায় হুক্কা হুয়া (ওই একটাই সে জানে), বরা গায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ, হরিণ গায়, ইঁদুর গায়, ছুঁচো গায়, বেজী গায়--কেউ চুপ করে থাকে না। গলা ছেড়ে বনের রোশন চৌকি বসিয়ে বন মাতিয়ে তুলি সক্কলে।

আমার যে ঘুম পাচ্ছে বড্ড!—হাই তুলে বলল কাঠবিড়ালি।

বিরক্ত হয়ে ঝিঁঝি বলল,—তা হলে বাপু তোমাকে বুঝোতে পারলাম না। তোমার ইচ্ছে হয় ঐ সিড়িঙ্গে গাছে যেয়ে দেখতে পার। ওখানে হুতোম দাদুর কোটর। দেখ গে, তিনি তোমায় থাকতে দেন কিনা একরাত।—বলে আর কথা খরচ না করে সে তারস্বরে রাগিনী ভাঁজতে শুরু করল।

তার দেখানো দিকটায় চাইতেই কাঠবিড়ালি দেখল একটা সরু সিড়িঙ্গে গাছ উঠেছে সোজা। সে নেমে এসে সিড়িঙ্গে গাছ বেয়ে উঠল। একেবারে মাথায় পোঁছে—যেখান থেকে মনে হল আকাশের তারাগুলো হাত বাড়ালেই পেড়ে নেওয়া যাবে—কাঠবিড়ালি দেখল একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার কোটর। ভিতরে কিছু দেখা যায় না। একটা সোঁদা গন্ধ নাকে লাগল কোটরের কাছটায় আসতেই। তারার আলোয় দেখল ঝনঝাট ঘষে ঘষে চকচকে হয়ে গেছে। কাঠবিড়ালি এক পা তুলে সেখানে রাখতে যাবে অমনি,—ক্যারর্ ক্যারর্—

কেরে কেরে কেরে!—কেরে অনামুখো পাজি ছুঁচো আমার কোটরে সিঁদ কাটতে এসেচিস্! বেরিয়ে যা—শীগ্‌গির বেরিয়ে যা—নয়ত সন্ত ঠুকরে দোব তোকে! বিশ্রী খোনা খোনা গলায় খনখনিয়ে উঠল কে ভিতর থেকে।

চমকে তিন পা নেমে এল কাঠবিড়ালি সড়াক্ করে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল—আমি সিঁদ কাটতে ঢুকিনি মশাই! আমি চিন্তামণি তীরের অধিবাসী কাঠবিড়ালি,—বিদেশী। রাতে একটা মুসাফিরদের বিশ্রামের জায়গা খোঁজ করতে করতে—



সটাং আমার আস্তানাটা চোখে পড়ে গেল?

আজ্ঞে বুঝিয়ে বলি—

মরে যাই! এমন খাসা দিকি এখেন থেকে!

কোটরটার গোল দরজার আবছায়ায় জেগে উঠল দুটো রূপোর আধুলির মত গোল গোল চোখ, গন্‌গনিয়ে চাইছে। কাঠবিড়ালি দেখল চোখ দুটোর মাঝে খাড়া খড়্গের মত বাঁকা নাক। তার মনে পড়ে গেল টিয়ারাম বাচস্পতির কথা। সবুজ চাদর গায় বসন্ত কালে উড়ে এসে তার বাদাম গাছের ডালে বসে নানা ভাষায় কথা কইতেন। ইনি হয়ত তাঁর কেউ। কিন্তু একটু খোনা। ফস্ করে বলে ফেলল—

আপনি কি হুতোম দাদু ভুতুম থুম্?

এইরে! পদবীটা জেনে ফেলেছে! ফিস্ ফিস্ করে ভাবল হুতোম। বাঁ টেরে চোখ বাগিয়ে বলল—যদি তাই হয়, তুমি আমার কি করতে পার? তোমার মৎলবটা কি শুনি? যাবে না কি পুলিশ ডাকবো!

মরমে মরে গেল কাঠবিড়ালি। বলল ক্ষুব্ধ স্বরে,—সত্যি বিশ্বাস করুন, আপনি না চাইলে একদণ্ডও আমি দাঁড়াবনা—

ইস—!

আর পঁাচারা সকালে কালোয়াতী গান গায়।

আম্মো কালোয়াতি গান জানি—দাঁড়া তোকে শোনাই!—

এমন সময়,

—হুতোম দাদুর কালোয়াতি গানের তাল কেটে যায়—লয় ঝুলে পড়ে! চিরিক্-চিরিক্ করে চেঁচিয়ে উঠল ঝিঁঝি অন্ধকার থেকে।

চোপরাও! ফাজিল কোথাকার! তোরা মার্গ সংগীতের কি বুঝিস র‍্যা? যতসব আধুনিক গাইয়ে ডেঁপো ছোকরা! আমি কোন ঘরানার গান করি জানিস—এক্কেরে ওস্তাদ বনবিড়াল লাল দেশমুখের খাঁটি ঘরানা! বাবা চালাকি নয়,—বলে হুতোম গান ধরল—

ধা—ধুম—তুম হুতুম গায়
পাড়াপড়শীর ঘুম ভাগায়
হুতোমের গীত শুনে মহাপ্রীত
প্রাণী আদি যত অরণ্যবাসী—

—ওই তো!—ওই তো—কেটে গেল—তাল কেটে গেল—হুয়ো হুয়ো! হুতোম গান গাইতে মোট্টেই পারে না! তারস্বরে চেঁচাতে লাগল ঝিঁঝি পোকা।

—সবুর—এইবার শোন্ একটা ভঁইয়াপুরি রাগিনী। কোথাও শুনিস্‌নি,—বলে একটুও না দমে সপ্তমে গলা ছেড়ে দিল পঁাচা। গোলমালে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ সিড়িঙ্গে গাছটার তলা থেকে আরও একজন, সে হ'ল গুপ্তসাধক—গেয়ে উঠল নাকী সুরে—

(ও হেঁ) আমি যঁমুনা পাঁরে যাঁবো গোঁ—
সোঁখি হে—এ এ এ এ—

—ওরে মাটি করেছে! এই চুপ—চুপ কর শীগগির—ওরে ছুঁচো তোর কেত্তন থামা!—সমস্বরে চীৎকার করে উঠল পঁাচা আর ঝিঁঝি পোকা।

খবরদার! কেত্তন নয়, মার্গসংগীতের আসরে কেত্তন গাওয়া অসম্ভব! বলল পেঁচা।

কেন না ? কেন না ? কেন না ? ছুঁচো প্রতিবাদ করলো। হট্টগোল বাদ প্রতিবাদের মধ্যে ছুঁচো গান বন্ধ করে সরে পড়ল।

হাঁপাতে হাঁপাতে পেঁচা বলল—দেখেছ কি অবিবেচনা এ দেশের পেতোকের? একটু গলা ছেড়ে গাইব তার উপায় নেই! অমন গান গাওয়ার ইচ্ছে হবে সবাকার!—একটু গুম হয়ে থেকে বলল,—না এদেশে আর থাকব না বাপু। বলত বাছা কি বলছিলে সেই কোন নদীর ধারে নাকি ভারী সুন্দর কোটর আছে বলাদিকন কান দুটো খুলে শুনি!—বলে পেঁচা পা তুলে কান দুটো সিধে করে নিল।

—গদ্যে বলব না পদ্যে ? জিজ্ঞাস করল কাঠবিড়ালি।

পেঁচা চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়ে বলল.—কি সব্বনাশ! দু রকমেও বলা হয় না কি ?

কাঠবিড়ালি কোন উত্তর না দিয়ে একটু মুচকি হেসে সুন্দর মিষ্টি গলায় আবৃত্তি করল ঃ

চিন্তামণি নদীর তীরে
মৃদুমন্দ বইছে ধীরে
ঠাণ্ডা হাওয়া শিরশিরিয়ে
মিষ্টি খুব!

চিন্তামণি নদীর জল
কাচের মত, ছলোচ্ছল
স্ফটিক দিয়ে বাঁধা তল
মিষ্টি খুব!

চিন্তামণির পাড় ডিঙিয়ে
সূয্যি ওঠেন দিক রাঙিয়ে
ভোরের পাখির ঘুম ভাঙিয়ে
মিষ্টি খুব!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! শুনতে চাইনে—ছিঃ!

কেন ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি।

ওই যে সুয্যি ওঠে! সে দেশে কী প্যাঁচা থাকে?

হেসে ফেলে বলল কাঠবিড়ালি—ও হো—ভুল হয়েছে, শুনুন মশাই তবে আর একটু—

চিন্তামণির টোপর ছেয়ে
আঁধার কালি মুছ দিয়ে
লক্ষ তারা রয় তাকিয়ে
চিক্‌মিকিয়ে।

ক্ষীরের বাটি মস্তো চাঁদ
আলোয় ধুয়ে নিশিরাত
একলা ওঠেন সাথে সাথ
ঝলমলিয়ে।

—বাঃ! বাঃ! চাঁদ ওঠে? ওঠে ত? খুশিতে দু পায়ে হাততালি দিয়ে উঠল পেঁচা।—বল্ ভাই কোন দিকে যাই সে দেশে—যেখানে মাঠভরা সোনা আর কোটর ভরা কি জানি কি—

কোটর নয়—সিন্দুক ভরা মোহর!—বাধা দিয়ে বলল কাঠবিড়ালি।

ওই হোল! আর সেথায় প্যাঁচানীরা নাকে নাকছাবি দেয়?

আর সক্কলে কালোয়াতী গান গায়!

বল্ দাদু কোন দিকে সেই যাদুমণি না চিন্তামণি নদীটি—?

সোজা পশ্চিমে—সোজা পশ্চিম—আঙুল দিয়ে দেখাল কাঠবিড়ালি সেই দিকে, যেখানে একটা মস্ত তারা মোমবাতি হয়ে গলে গলে পড়ছিল।

হুতোম মস্ত ডানা মেলে উড়ে পড়ল—

ক্যারর—ক্যারর—
আমি হুতোম জবড়
পেয়ে ধনের খবর
ছুটে গেলাম সত্বর
সেথা সিন্দুকে মোহর
এবং বৃক্ষেতে কোটর

এবং পেঁচাদিগের নারী
নাকে নাকছাবি দেয় ভারী ;
এবং কালোয়াতী সাধার
সেথা নেইকো কোন বাধা ॥

সোঁ সোঁ করে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল হুতোম যে দিকে হনুরা ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে ছল।

যা হোক,—রাত্তিরে আস্তানা একটা মিলল তবু—ভাবল কাঠবিড়ালি। ঝন্‌কাঠ ডিঙিয়ে সে ভিতরে ঢুকল। কোন গতিকে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে ভোরবেলা আবার যাত্রা করা যাবে। কি জানি কপালে কি লেখা আছে। এদিক ওদিক চাইছিল ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ নাকে একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ এসে লাগল। তারার আলো উজিয়ে ঢুকেছে ভিতরে। একটু ঠাহর করে দেখল কোটরের দেওয়াল এবড়ো খেবড়ো। মস্তো কোটর সেটা। চারিদিকে দেওযালে গাঁথা বড় বড় তাক। থাকে থাকে সার সার লাল খেরোয় বাঁধাই হিসেবের খাতা। একটা খাতা পেড়ে পাতা উল্টোতেই দেখতে পেল লাল কালি দিয়ে লেখা—

নাম—গিরগিটি চন্দোর মুখটি
ধাম—নিমগাছ
কর্জ—১০১ টাকা॥ হার মাসে ১১০ টাঃ হিসাবে মোট—২২১ টাঃ॥
চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ-কষা কবুল করিয়া লইলাম। ইতি—
স্বাক্ষর (তিন আঙুলের ছাপ)
সন—৭১৭১ বটবৃক্ষাব্দ।

এ্যাঁ! হুতোমের কাছে দেনায় চুল বিকিয়ে রেখেছে গিরগিটি ভাই? চমকে উঠল কাঠবিড়ালি। তারপর কয়েকটা পাতা উল্টে আবার পড়ল। কি সর্বনাশ! এ যে তার জানাশোনা প্রতিবেশী প্রত্যেকের নাম টোকা! এমন কি এক জায়গায় দেখল বুড়ো বাহাত্তুরে কচ্ছপের নামে লেখা—

"আমি শ্রীকরণ-কারণ কচ্ছপ পরম বন্ধু হুতোম পেঁচার কাছে দশ টাকা সুদ চান্দ্রমাসিক ত্রিশ টাকা হারে কর্জ লইলুম।"

কি কষাই সুদখোর হুতোম! তাই এত টাকার অহংকার! অধর্মে রোজগার টাকা—! রাগে গস্ গস্ করতে লাগল কাঠবিড়ালি। যা হ'ক এখন ত একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। ঝনকাঠে ঝোলাটা রেখে তার উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল কাঠবিড়ালি। চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ।

হঠাৎ—ঠক্! ঠক্!

চমকে মাথা তুলে তাকাল কাঠবিড়ালি। কে ঠক্ ঠক্ করে দুপুর রাতে? সিড়িঙ্গে গাছটার গুঁড়ি বেয়ে একটা আওয়াজ ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে আসছিল—ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্! কেউ যেন কুড়ুল দিয়ে গাছটার এক জায়গায় না কেটে আগাগোড়া কাটছে। ঠক্ ঠক্! তাই তো। এ আবার কোন নতুন উৎপাত?

আওয়াজটা উঠে আসতে আসতে কোটরের মুখের কাছে এসে থেমে গেল।

কাঠবিড়ালি চেয়ে দেখল একটা বেজায় অদ্ভুত মুখ তার দিকে দেখছে প্যাট্ প্যাট্ করে। লম্বা সরু গলা, মাথায় মস্ত ঝুঁটি। একটা লম্বা বাঁকা ঠোঁট গঁইতির মত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখছিল তার দিকে চেয়ে একদৃষ্টে। কাঠবিড়ালির হাসি পেল ওর ভাব দেখে। বোবা নাকি? কোটরের ঝন্‌কাঠে বার দুই ঘা দিয়ে আবার হাঁ করে চেয়ে রইল সে। একটা ফিস্‌ফিস্ কথা কানে এল—

বাবু বাড়ি নেই?

বাবু? হুতোমের কথা বলছ?

আজ্ঞা তেনার কথাই বলছি।

তুমি কে?

হাঁ, আজ্ঞা!

যাঃ—জিগোস্ করছি তোমার নাম কি?

মুই জেতে কাঠঠোকরা আজ্ঞা!—তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বলল—আপুনি বুঝ—?

কি ?—ঢাকাল কাঠবিড়ালি।

কর্জ কাত্ত আইচেন ?

হো হো হো!—হেসে উঠল কাঠবিড়ালি—তুমিও বুঝি সেই জন্যে এসেছো ?

আজ্ঞা আমার মেয়ের বিয়ে এই আগাম পরশু আত্তিরে। গরীব গেরস্ত লোক বাবু কোন গ তকি কাঠুপরে দিন চ'ল যায়। মেয়েডাবে প'র কত্তি চেয়ে সম্বন্ধ কন্নু। বরপক্ষ যৈতুক চয় একডা পিত্‌লের ঘড়া, কাম্বিশের জুতো, আর তুখান থেলো হুঁকো। নইলে বিয়ে বরবাদ হয়ে যাবে। তাই টাকার বিশেষ জরুরোত। বাবুকে কবেন কি সুদের জন্যে মোটেক চিন্তে করবেন না।—

কিন্তু হুতোম দাদু যে বাসায় নেই ?

নেই ?

না।

যাক্ বাঁচা গেল! সুদটে আর দিতে হল নি।—নিঃশ্বাস ফেলে কাঠঠোকরা ঠকঠকাঠক তুবা'র মেরে নিল গৌকাঠের উপর।

কত টাকা সুদ এনেছিলে ?

গেল সনের মোট একশত পাঁচ টাকা।

এঁ্যা! এত টাকা সুদ দিয়ে আবার ধার করতে চাও? অবাক হয়ে জানতে চাইল কাঠবিড়াল।

আজ্ঞা তা কি করি বলুন! ছাড়বেনা মহাজন। ক্যারর্ ক্যারর্ করে পাগল করে দেবে!—টুপিটা মাথার ওপর সিধে করে রেখে কাঠঠোকরা ঠকঠকাঠক ঠুকতে লাগল গাছের গা।

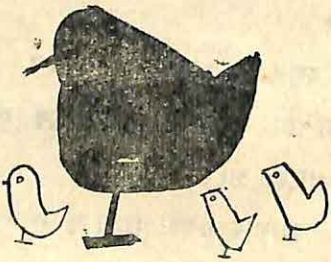
বললে কাঠবিড়ালি,—আমায় একটা বাসা খুঁজে দাওনা। গাছে গাছে ত ঘোর অনেক।

কেমন বাসা? চ্যাপ্টা না সরু না গোল না লম্বা? জিজ্ঞাসা করল কাঠঠোকরা মুখ তুলে।

এই মাটি করেছে! বাসা আবার গোল না চ্যাপ্টা? কতকটা নির্ভরসা

হয়ে বলল কাঠবিড়ালি—এই বাসা একটা থাকবার মত—মানে যাকে বলে আরামপ্রদ,—যেখানে একটু আরামে থাকা যায়।

বাসায় থাকা যায়? ত্‌তা—তো বলতে পারি না। আমি কাঠঠোকরা দিন-আত্তির ঠকঠকাঠক ঠুকে দেখি যে বাসাটা গোল কি চৌকো কি সুতোর মত কি ফিতের মত। সে খবর রাখিনে কত্তা,—বলেই সাঁ করে সিড়িঙ্গে গাছটা বেয়ে নেমে গেল সে এক নিমেষে।



পাঁচ



হ্যাঃ! হ্যাঃ! বেশ আকাট মুখ্যু!—

কে একজন গাছের তলা থেকে ভীষণ শ্লেষ কেটে হেসে উঠল। কাঠাবড়ালি চমকে ঝুঁকে তাকাল। কে আড়ি পেতে শুনছিল? দেখল, সিড়িঙ্গে গাছটার গুঁড়ির কাছে চার পায়ে কে একজন দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হতেই বলল সেজন—

নমস্কার!

মুখে বিনয়ের সিঁটকুটে হাসি। কাঠবিড়ালি দেখল সিধে উঁচু ল্যাজ ছোট ছোট পা এবং চাকামুখ চকচকিয়ে একজন চাইছে। একগাল হেসে বলল—কাঠঠোকরার সঙ্গে কথা কইছিলে? ওটা বেজায় মুখ্যু। একেবারে চাষা বুদ্ধির বেহদ্দ!

নিন্দে করা কাঠবিড়ালির ভাল লাগল না। অল্প আলাপ হলেও তার মনে হয়েছিল কাঠঠোকরা লোকটা খেটেখুটে সৎভাবে জীবন যাপন করে। হয়ত অনেক বড় সংসার, তাই টানাটানি হয়ে পড়ে কখনো। আর এত খাটুনী খাটলে বুদ্ধির ভাগটা স্বভাবতঃই একটু কমে যাওয়াই সম্ভব। তাই কথাটা শুনতে পায়নি এইমত ভাণ করে বলল—আপনি কে?

—আমি শ্রীবনবেড়াল লাল পোদ্দার। পেশা জীবজনের উপকার করা। শুনতে পেলেম যেতে যেতে মশাইয়ের একটা বাসার বিশেষ প্রয়োজন। ভাবলেম নিশ্চয়ই কোন বিদেশী বিপদে পড়েছে। অমনি আমার মনটা কেঁদে উঠল। অমনি ভাবলুম—আমি ছাড়া কে আছে এ বনমুলুকে বিপদে বিদেশীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে? তাই না এলেম ছুটে?

শুনে কাঠবিড়ালির মনটা মিছ রর মত গলে গেল। তা হলে বনে সবাই হনুর মত গুণ্ডা আর হুতোমের মত অনাথতিপরায়ণ নয়। এক-আধটা পরোপকা ী সুজন মানুষও আছে। বললে খু শ হয়ে—পরম সৌভাগ্য, পোদ্দার মশ ই. আপনার সাক্ষাত মিলল। আমি হলেম চিন্তামণি তীরের কাঠ বড় ল মোকাম বাদাম গাছ। পরশু রাতে একটা স্বপন দেখোছলেম ভয়ংকর। গিরগিটি বন্ধুর পরামর্শে ত ই দেশ-ভ্রমণে বে রয়েছি। এখন একটা বাসা যদি পাই ত থাকি দিনকত আর বনরাজ্যটা ঘুরে ফিরে দেখি।

চোখ বড করে তাকিয়ে বলল চাকামুখ—চিন্তামণি তীরে তোমার বাড়ি?

আজ্ঞে হাঁ।

চি—ন্—তা—মণি তীরে?

হ্যাঁ হ্যাঁ!

সেখানে যে বিষম বড়লোকেরা থাকে!

লজ্জা পেয়ে কাঠবিড়ালি বলল, না, এমন আর কি বড়লোক আমরা। সাধারণ অবস্থা সব্বারই। কেবল কোলাবা কাকার একটা আধুলি আছে।

না না না না!—না, মোটেই না! মোট্টেই না! আগে কি জানতেম মশাই আপনি কে? কে না জানে চিন্তামণি নদীর নামডাক। কে না জানে লক্ষপতি কোল ব্যা মুস্তোফির কত ধন দৌলত—

তাঁর পদবী মুস্তোফি নয় মশাই—মিশির—

ওই হল যা নেই পদে তা হয় অর্থে! বুঝলে ভায়া! তা তুমি ভাই কি এই জংলি দেশে অন্ধকার ঘুপচি একখান কোটরে থাকতে পার?—এই বলতে বনবিড়ালের গলাটা বেজায় মিষ্টি হয়ে এল, এত মিষ্টি যেন তা থেকে টপটপ করে ম ঝরছিল। বলল,—হ্যাঁ, তোমার দরকার সুন্দোর—গাড়ি-বারান্দাঅলা বাড়ি—আর চারপাশে ফুলের বাগান—আর একটা ঝরণা নেমেছে—যার লাল পাথর দিয়ে বাঁধান সরু পথ চলে গেছে বাগানের মধ্যে সোজা—দুধারে তার দেবদারু সারি হাওয়ায় দুলছে আর মিষ্টি মিষ্টি আখরোট বাদাম-মনাক্কা-পেস্তা-লকেট-লবঙ্গলতিকার গাছ সে বাগানে!—চাকামুখ চোখ বন্ধ করে যেন মনে মনে দেখতে লাগল বাড়িটা। বলল,—বেশ! ঠিক

তেমনিই আছে বটে! তারপর হঠাৎ চোখ খুলে বলল,—হ্যাঁ এমন বাড়ি একখানা, কি বল?

কথাগুলো গিলছিল কাঠবিড়ালি। বলল, ত্—তাই না কি?

নয়ত কি? বলল বনবেড়াল।—শুধু কি তাই? থাকবে মস্ত বৈঠকখানা ঘর। নরম তুলতুলে কৌচ জাজিম দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে কালো দেয়াল ঘড়ি, মাথায় সাদা হাতির দাঁতের হরিণ বসানো—ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজবে সুর করে—ঢংঢং—ঢংঢং—ঢং! আর দাস-দাসী বিস্তর। চারটে সাদা ধবধবে ঘোড়া সামনে আর চারটে কালো কুচকুচে ঘোড়া পিছনে টেনে নিয়ে যাবে জুড়িগাড়ি একখান—সহিস বাজাবে ঘণ্টা ঠনন্‌ন্‌ ঠং ঠং—ফলের বাজারে মুখ তুলে চাইবে সুর্মা চোখে ফলওয়ালা—ঠং ঠং—এইয়ো—সরে দাঁড়াও—এগারো রাজার পাড়ায় যাচ্ছে! খবরদার—খবরদার! পথের লোক থমকে সরে দাঁড়াবে—বলবে, ব্বাপ্! এ কোন বড়লোক যায় রাস্তা দিয়ে! কেমন কিনা?

ত্‌ত্—তাই নাকি?

নয়ত কি?—বললে চাকামুখ বাদামী চোখে চেয়ে।

হঠাৎ কাঠবিড়ালির বিষম সন্দেহ হল। চারিদিকে ঘুটঘুট্ করছে অন্ধকার। কোথায় সেই বাড়ি, ফলের বাজার, রাজার পাড়া?

হা! হা! হা! বেজায় ঠাট্টার সুরে হেসে উঠল চাকামুখ। আরে জংগলে কি দেখা মেলে চট্ করে? সব আছে, কিন্তু স—ব লুকানো গাছের আবডালে। যারা ওস্তাদ তারাই না খালি দেখতে পায়! যা হোক্, সে ভাবনা আমার। তোমার বাড়ি চাই?—ল্যাজটা থুতনির নীচে রেখে জিজ্ঞাসা করল বনবড়াল।

পোদ্দার মশাই, আমি একটা খু-উব সুন্দর বাড়ি চাই! কোটর থেকে গলা লম্বা করে ঝুঁকিয়ে বলল কাঠবিড়ালি—ঠিক যেমনটি বললেন।

আল—বৎ! সে এমন বাড়ি আর কী বলব! তার সোনার সিঁড়ি রূপোর দালান, মেঝে লাল নাল পাথরের ফুল আঁকা। বারান্দায় একটা সাদা হাতি ঘুরে বেড়ায়!

পান্তেয়ার মত চোখ করে বলল অন্যজন—ত্‌তাই বুঝি? তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—আমার কিন্তু হাতিকে বড্‌ড ভয় করে!

দূর! এ কি ছোট জাতের কেলে হাতি? কুলো কান, কুচ্ছিত চেহারা? এ হল তুলোর মত সাদা নরম ভয়ানক মিষ্টি হাতি। ভী—ষণ আক্রা!

হঠাৎ বনবেড়াল চুপ করে রইল। সে এমন চুপ যে মনে হল ঘুমিয়েই পড়েছে। যেন আঁকশি দিয়েও একটি কথা তার পেট থেকে তোলা যাবে না। কাঠবিড়ালি একটু চুপ করে থেকে ডাকল—

পোদ্দার মশাই! কখন বাড়িটা পাব?

সাড়া নেই। পোদ্দার চোখ মুদে মৌনী হয়ে আছে।

অ—পোদ্দার মশাই!

উঁ!

কই আমায় নিয়ে চলুন সে বাড়িতে?

সাড়া পাওয়া গেল না। বনবেড়াল চোখ মুদে সাধুর মত একটা জমাট হাসি মুখে এঁটে বসে রইল।

ছটফট করে ল্যাজটা ছড়ির মত ঘুরিয়ে বলল কাঠবিড়ালি, অ—পোদ্দার মাশাই—আপনি কি ঘুমিয়ে প'লেন?

না, ভাবছিলাম।

কেন ভাবছিলেন? চলুন না—

সে বাড়ি পাওয়া বিস্তর হাংগামা—

কেন—কেন—কেন—?

সোজা কথা?—দপ করে চাইল বনবেড়াল।—সে দলিল ওঠবন্দী তমসুক চাকরান সোলেনামা, বকেয়া সাবেক মোকরর্ মৌরুশিপাটা দস্তখত। তার সাথে ধরলাম দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর আসল-নকল দস্তাবেজ হস্তান্তর এজরার, এ সব তামাম সই করে রেজিস্টিরী করতে হবে।

ই—ঃ! হাঁফ ছেড়ে বলল কাঠবিড়ালি।

না! তেমন কি আর শক্ত! দলিল লেখাই যা না ওস্তাদী! সবাই

ত আর জানে না। অনেক লেখাপড়া করে হাত মক্স করতে হয়। সবাই পারে না—পারে না—! ঘাড় ত্বলিয়ে ত্বলিয়ে হাসতে লাগল সে।

—আমি যে দলিল লিখতে এটুও জানি না পোদ্দার মশাই! কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে কাঠ বড়ালি।

কি—চ্ছু ভেব না! তোমাদের আশীর্ব্বাদে এসব লেখাপড়া আমি একটু শিখেছি। কে না জানে বনবেড়াল পোদ্দারের মুন্সীয়ানা? আর বন্ধুর উপকারই যখন তার পেশা!—এ্যাঁ—কি বল? তা হ'লে লিখি? বলে বনবেড়াল পকেট থেকে একটা গোল মোটা ফ্রেমের চশমা বের করে এঁটে নিল নাকে। তারপর খস্খস্ করে কাগজে লিখল—

দশ মোহর ডেমী—
ত্বই মোহর ফুলুস্কেপ—
পাঁচ মোহর ওকালত নামা—
ত্বই মোহর নজরানা—
এক মোহর মুন্সী শ্রীবনবিড়াল লাল পোদ্দার—

ইথ মবলক বিশ মোহর দেয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলাম।.........

বলে কাগজটা দেখিয়ে বলল—তুমি নেমে এসে এই চুক্তিতে সই কর। কাঠবিড়ালি তখন মস্ত বাড়ির স্বপ্নে মশগুল। তরতর করে নেমে এসে যেই বনবেড়ালের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে সই করতে যাবে, অমনি—

কোরোনা! কোরোনা! আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কে গাছের গুঁড়ির কাছটা থেকে।

চমকে ফিরে তাকাল তারা। ছোট্ট একটা উই ঢিবি উঠেছিল গুঁড়ির গা বেয়ে। আর তার চূড়ো ছুঁয়ে নেমে এসেছিল একটা গাছের ডাল। তার ওপর বসে নীচে মুখ করে কে একজন চেয়ে আছে তাদের দিকে। চোখোচোখি হতেই অমনি সে আবার বলে উঠল,—খবরদার! সই কোরো না। ও ভীষণ দালাল! আমি ওকে চিনি—ও সর্বঘটে ফাঁকিবাজির সর্দার। তোমাকে ফতুর করে দেবে!

থ' হয়ে কাঠবিড়ালি চেয়ে রইল বনবেড়ালের দিক। তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে চাইল ডালে বসা সেই অন্যজনের দিকে।

শয়তান!! তোকে কপ্ করে খাব!—বাঁ করে চশমাটা পকেটে পুরে ফেলে তড়াক্ করে লাফ মারল বনবেড়াল ডালটার দিকে। চক্ষের নিমেষে অপর জন ডাল থেকে নেমে উইয়ের গর্তে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে একটুখানি গলা বাড়িয়ে তর্জে বলল, খ—বর্দার! ঠগ্ বেড়াল! বিদেশীকে ঠকাবার চেষ্টা! দোর তোর হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে?

রাগে পিঠ ধনুকের মত বেঁকিয়ে একটা মস্ত হাঁ করে বনবেড়াল তাকাল তার দিকে। কাঠবিড়ালি সভয়ে দেখল সেই হাঁয়ের মধ্যে সারি সারি ধারালো দাঁত লুকোনো ছিল। অমনি চুপ্‌টি পিছিয়ে তড়াক করে উঠে গেল সে গাছ বেয়ে। গর্‌র্‌র্—গর্জে উঠল বনবেড়াল।

—পা—জি গেছো ইঁদুর! ধরতে পারি তোর মস্তকটা কড়মড় করে ভক্ষণ করব পহেলা! তারপর ল্যাজটা আর কান দুটো! আর তোর গোঁফ জোড়া গেঁথে রাখব আমার দাবা বোড়ের রাজার ঠেঁটে! ইস্টুপিট ফক্কড় ইঁদুরো! দে আমার সোনার ধানগুলোর বকেয়া দেনা শোধ সওয়া বিশ মণ! কবুল করে ফাঁকি দেওয়া! জানিস তোর নামে ডিক্রী জারি করতে পারি?

—আর আমি ফৌজদারী করতে পারি তা জানিস্? তুই আমায় কামড়ে দিবি বলে চস্‌নে?—রুখে জবাব দিল ইঁদুর।

আমি ১১০ ধারায় মামলা ঠুকবো তোকে আসামী মেনে।

আমি ১১১—১১২—১১৩ ধারায় তোকে দায়রায় সোপর্দ করব! ভেবেচিস্ কি?

বেচারী কাঠবিড়ালি! সে কিচ্ছু এই সব এত ধারা এত মামলার কথাবার্তা বুঝতে পারছিল না। সে বুঝতে পারল এইমাত্র যে বনমুল্লুকে সবাই বেজায় আইনজ্ঞ, মামলাবাজ। দাঙ্গাও করে। মনটা তার মুষড়ে পড়ল। তার স্বপ্নের প্রাসাদ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যাক্—! হয়ত ঝগড়াটা শেষ অবধি হাকিমের এজলাসেই পৌঁছত। কিন্তু ঠিক সেই

সময় দূরে শুকনো পাতা খড়বড় করে কাকে হাঁচোর-পাচোর করে এগোতে দেখা গেল। অমনি বনবেড়াল চীৎকার করে উঠল,—ওই যে, ওই আরেক পাজি—আমার পাওনা উশুল না মিটিয়ে ভাগছে! ধর! ধর! ধর বোম্বেটেকে! বলে হুরদাড়িয়ে ছুটলো সেদিকে। যার দিকে ছুটলো, একবার পিছন ফিরে চেয়ে সেও ছুট দিল হড়বড় করে।

—দে আমার বকেয়া মিটিয়ে—ভাল হবে না বল্ দিচ্চি পালিয়ে গেলে! এ্যাঁ—আমি রাগলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না আর! বদমাস্ বেইমান ছুছুন্দর!—চেঁচিয়ে গালি পাড়তে পাড়তে মিলিয়ে গেল দূরে বনবেড়াল।



—ও হোল কাঁটাকড়ি করকরে সজারু। দেখলে ত পাজিটার ফন্দী? সজারুর বড্ড সখ হয়েছিল তার কাঁটাগুলো রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে নেয়। খালি খসে খসে যায়, তাই বাঁধিয়ে নিলে আর খোয়া যাবার ভয় নেই—ভেবেছিল ও। অমনি বনবেড়াল হাজির। বলে,—রূপো কেন—এমন স্যাকরার কাছে নে' যাব যে, একেবারে সোনা দিয়েই বাঁধান হয়ে যাবে তোমার কাঁটাগুলো! আর বোকারাম তাই শুনে যেই কিনা সই করেছে চুক্তিতে, অমনি—দাও টাকা, দাও টাকা,—চুক্তি করেছো দিতেই হবে!—কান ঝালা-পালা করে দিতে লাগল দিবারাত্তির। এধারে স্যাকরার দেখা নেই। আজ তার মেয়ের বিয়ে, কাল জামাই ষষ্ঠী, পরশু বেয়ানের সাথে মোলাকাত—এমনি হাজার ওজর খালি কেবল। তাই সজারু ওকে দেখলেই পালিয়ে যায়! বলে গেছো ইঁদুর তাকাল বনবেড়াল যে দিকে ছুটে গিয়েছিল সে দিকে। কানে ভেসে এল তাদের,—বদমাইস্! পাজি! পালিয়ে যাচ্চিস্!

কে উত্তর দিল বিরক্ত গলায়,—খবরদার ! সরে যাও বলচি ! নইলে কাঁটা ফুটিয়ে দোব প্যাঁক করে !

কাঠবিড়ালি ত্রস্ত হয়ে ভাবল,—এই রে ! এবার বুঝি একটা খুনোখুনি হয় ! তার মুখের ভাব দেখে গেছো ইঁদুর বলে উঠল,—ভাবছ মারপিট হবে ? কিচ্ছু না। অমনিই স্বভাব বনবেড়ালের ! তুমি এখন এস আমার বাড়িতে। একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও ভাই।

বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কাঠবিড়ালি। সকাল থেকে কেবলই ঘুরছে। এখন রাত এক-পা ফেলে এগিয়ে গেছে। বনবেড়ালের গল্প-ফাঁদা বাড়িটা হাওয়ায় অমন মিলিয়ে যেতে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। গেছো ইঁদুরের (তাকে তাই মনে হয়েছিল কাঠবিড়ালির) আমন্ত্রণে তাই মনটা স্বস্তিতে ভরে উঠল।

নিজের পরিচয় অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবেই দিল তার সঙ্গী চলতে চলতে,—তুমি আমাকে 'গেছো ইঁদুর' বা কেবল 'ইঁদুর' বলেই ডেকো। যদিও আমাদের গোত্র নাম 'গেছো' তবু আমার বাসাটা মাটির নীচেই করেছি। এসো ভাই !—বলে সে কাঠবিড়ালির একটা হাত তুলে নিল তার হাতের মুঠোয়।



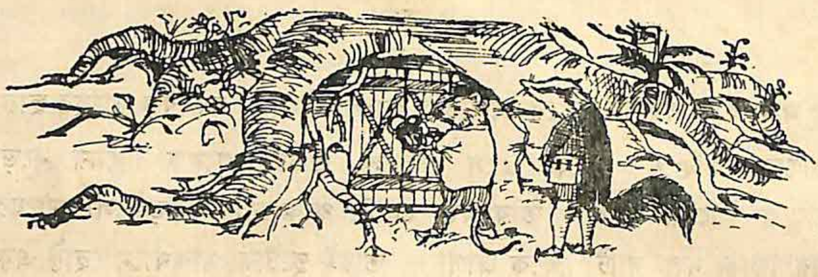
ছয়

দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছিল বন-পথ ধরে। বড় বড় গাছের ছায়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে শেষে এসে পৌঁছল একটা অনেক দিনের বুড়ো থুরথুরে গাছের নীচে। তার মস্ত মোটা পাকানো শিকড়গুলো মোষের শিরদাঁড়ার মত মাটি থেকে জাগা। তারই দুটোর মাঝখানে ছোট্ট এক দরজা, কবাট বন্ধ। করাটের গায়ে চার কিনারায় ফুল লতাপাতার মীনা করা একটা তামার পাতে লেখা রয়েছে ঃ

শ্রীবনস্পতি তরফদার ইঁদুর	● আছেন ● নেই

ইঁদুর তার বাদামী পশমের কোটের বোতামের ঘরে ঝুলোনো রূপোর চেনে বাঁধা ছোট্ট একটা হাতীর দাঁতের চাবি বার করে কুটুং করে তালা খুললো। ভিতরে দেখা গেল এক লম্বা শুঁড়ি-বারান্দা। দুধারে সারি সারি থামের মাথায় জেগে থাকা তাক, তার উপর মোমবাতি জ্বলছে। আলোয় এসে গেছো ইঁদুরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল কাঠবিড়ালি। তার মনে হল ওর চেহারায় বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের ভাব রয়েছে। বয়সে তারই সমবয়সী। রং উজ্জ্বল মেটে। চোখ দুটোর রঙ পাকা বাদামী, গোঁফও তাই। পোষাক-আশাক সাদাসিধে হলেও তা যে খুব একজন ওস্তাদ কারিগর বানিয়েছে তা এক নজরেই ঠাওর হয়। শুঁড়ি-বারান্দার দেয়ালে সার সার তেলরঙে আঁকা ছবি, সোণালী কারুকার্য করা ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিগুলো সবই মস্ত মস্ত গোঁফঅলা ইঁদুরদের।

একখানি ছবি খুব একজন বুড়ো গোছের ইঁদুরের। তাঁর সব কটা গোঁফ পেকে সাদা ধবধবে হয়ে গেছে। নীচে সোনার হরফে লেখা,—রায় শ্রীগণেশ বিক্রম সিং তরফদার ইঁদুর বাহাদুর জে. টি. ই। তাঁর গায়



মখমলের জমকালো কামিজ আঁটা। তাতে মেডেল ঝুলছে বারটা। কোমরে বাঁকা প্রকাণ্ড তলোয়ার আর দুটো পিস্তৌল। বাঁ হাতে তামাক খাওয়ার একটা বিদেশী পাইপ ধরে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন যেন অনেক দূরে।

—উনি আমার দাদুর দাদুর দাদু,—বলল গেছো ইঁদুর।—যেবার সমস্ত পশুপক্ষিদের প্রথম ভীষণ মহালড়াই হয়েছিল সেবার উনি পশুকুলের মহারাণীর একলক্ষ চৌদ্দ হাজার ফৌজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহাসমরে। পক্ষি আর জলবাসী শত্রুদের ব্যূহ ছারখার হয়ে গিয়েছিল ওঁর বীরপনায়। প্যাঁক প্যাঁক করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তারা পালিয়ে যায়। তাই মহারাণী নিজের হাতে গুণে বারটা মেডেল ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর বুকে।

কাঠবিড়ালির তাক লেগে গেল এসব শুনে। মনে ভাবল—কী নাম-করা বংশের ইঁদুর তার সঙ্গী। শুঁড়ি বারান্দা পার হতে বার বার ফিরে দেখতে লাগল সেই বীরপুরুষের ছবিটার দিকে।

হাতে একটা টান দিয়ে ইঁদুর বলল—চল আমরা ভিতর বাড়িতে যাই। কুলঙ্গী থেকে একটা বাতিদান পেড়ে নিয়ে সে চলল আগে আগে। অনেক বারান্দা উঠোন মহল পেরিয়ে চলল। সিঁড়ি বেয়ে কত তলা যে উঠল বা নামল তার হিসেব নেই। পাশ দিয়ে সরু সরু অলি চলে গেছে এ-

পাড়া ও-পাড়ায়। মোড়ে মোড়ে আলো-জ্বলা দোকান। ওপরে লেখা "সমবায় সমিতি।" ভিতরে চূড়ো করা ভুট্টা, ধান, সরু সুগন্ধী চাল, বাদাম, হরিতকী, আঁশফল, পেয়ারা ; পোশাক-আশাক, তীর ধনুক, বেলুন, আরও কত কি। একটা মস্ত নাটমন্দির পড়ল পথে। দেয়াল অন্ধকার ফুঁড়ে উঠেছে। মাথায় আকাশ-জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের অন্ধকার ভরা রাত। অনেক পাড়া পেরিয়ে এসে শেষে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একতলা, দোতলা এমনি অনেক তলা ঘুরতে ঘুরতে উঠে এক জায়গায় এসে তারা থামল। ইঁদুর পিছন ফিরে বলল—এস, এইটে আমার ঘর। কাঠবিড়ালি চেয়ে দেখল সেটা একটা ছোট্ট ঘর।

কিন্তু কি চমৎকার! দেয়াল ফিকে গোলাপী কাগজে মোড়া। আড়া থেকে শিকলে ঝুলছে বাতি। তার নরম আলোয় ভরে আছে ঘরখানা। শৌখিন আসবাব অল্প দুটি চারটি। আর দেয়ালে জলরং দিয়ে আঁকা সুন্দর ছবি কটি। কি সুন্দর! চেয়ে চেয়ে কাঠবিড়ালি চোখ ফেরাতে পারল না। একটায় হলুদ রঙের পাকা ধানের ক্ষেতে ইঁদুরেরা কুট্ কুট্ করে কেটে নিচ্ছে শিষগুলো। আর একটায় সোনারং গমের আঁটি কাঁধে করে ফিরছে সন্ধ্যে বেলা ইঁদুর স্ত্রী পুরুষেরা। মাঠের শেষে তখন সূর্যদেব দিগন্তে রঙের বাটি উপুড় করে নেমে যাচ্ছেন। একটা ছবির দিকে চাইতেই কাঠবিড়ালির বুকের ভিতর বিষম জোরে ঘা দিয়ে উঠল। সে একটা নদী—এঁকে বেঁকে চলেছে একলা, রূপুলী তার জল। আর একটা গাছ ডাল মেলে আকাশে—তার পাতাগুলো সব গাঢ় লাল—!

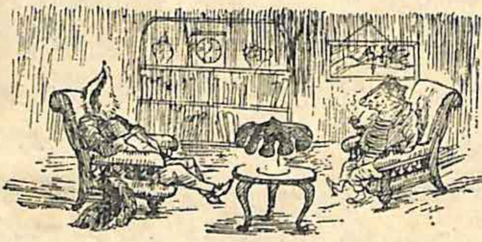
কাঠবিড়ালি জিজ্ঞাসা করল,—ভাই ইঁদুর, এ ছবি কোথাকার ?

তা ত জানি না ভাই কোন দেশের ছবি ওটা। আমার এক কাকা একবার দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন অনেক দূর দূরান্তে। এক জায়াগায় এক নদীতীরে এসে তাঁর এত ভাল লাগে যে সেখানে বসেই ওই সুন্দর ছবিটা এঁকেছিলেন।

কাঠবিড়ালি চুপ করে রইল। সে দেশের ঠিকানা সেই কেবল জানে।

তার মনটা উদাস লাগল, যেমন শরতের টলটলে দিনে মেঘগুলো আনমনে চলে যায়। কোথায় যার ঠিকানা কেউ জানে না।

ঘরের কোণে একটা মস্ত কেতাবের আলমারী। কাঠবিড়ালি উঠে এসে পড়তে লাগল সোণালী হরফে লেখা নামগুলো। চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা কেতাব। গল্পে ঠাসা। কী মজার গল্পই না আছে লেখা পাতা গুলোয়! ইঁদুর এসে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল,—তুমি একটু বসে থাকো একলা। আমি চা করে আনি। আমার অনেক কথা আছে তোমায় বলব সব। ইস্—! কতকাল যে এই জংগল মুলুকে একজন সভ্য জীব আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেয় নি তার ইয়ত্তা নেই। তোমায় ভাই পেয়েছি যখন ছাড়বনা। বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে গেল সে চা করতে।



একটা তুলতুলে কৌচের ভিতর গা এলিয়ে দিয়ে কাঠবিড়ালি ভাবতে লাগল, কি ঐশ্বর্যবান গেছো ইঁদুর। কত শৌখিন জিনিস তার ঘরে। তার এ সবের একটাও নেই। সবার সেরা সেই ছবিটা। চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসছিল··হঠাৎ তাকিয়ে দেখল ইঁদুর পাশে দাঁড়িয়ে। একটা ফুলের মত পরিষ্কার ট্রেতে ঝিনুকের পেয়ালা আর চা-পাত্র হাতে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলে? জিজ্ঞাসা করল ইঁদুর।

একটুও না! চোখ মুছে বলল কাঠবিড়ালি।

এক চুমুক খেয়ে দেখ। বলে ইঁদুর বসল আরেকটা কৌচে—

কথামত কাঠবিড়ালি ঝিনুকের পেয়ালায় চা ঢেলে এক চুমুক দিল।

অমনি ঘুমের মিহি পর্দাটা হুস্ করে উড়ে গেল। হৈ হৈ করে মনটা তার জেগে উঠল। একটু অবাক হয়ে তাকাল সে ইঁদুরের দিকে।

আর ঘুম পাবেনা!—মিচকে হেসে বলল ইঁদুর। আমার এ চা ডুডুম গুজুতুপ্ পাবুঢ্ ঢাখাম্পার চা বাগিচা থেকে আনা। এক চুমুক খেলে পুরো এক দিন রাত ঘুম পায় না।

কাঠবিড়ালি বলল—ভাই ইঁদুর, তোমার বাসায় ঢুকে অবধি আমার মনে হচ্ছে এই বেশ ভাল। আমায় একটা কোটর খুঁজে দাও। রোজ তাহলে তোমার সুন্দর ঘরে এসে আমরা মনের সুখে গল্প করব।

ইঁদুর কোন উত্তর দিল না। আপন মনে সে আবার দুজনার পেয়ালায় চা ঢেলে পেয়ালা হাতে বসল তার কৌচে। তারপর গম্ভীর হয়ে কি ভাবতে ভাবতে একটা পাইপ টেনে বার করল। খুব মনোযোগ দিয়ে পাইপে তামাক ভরে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দুটো টান দিল ধীরে ধীরে। তারপর পাইপ হাতে চোখ বুঁজে রইল। কি গভীর কথা ভাবছে ইঁদুর? ভেবে খুন হল কাঠবিড়ালি! কিন্তু ইঁদুর কোনো সাড়াশব্দ দিল না অনেক—অনেকক্ষণ। বলল শেষটায় ইঁদুর।

—শোনো কাঠবিড়ালি ভায়া, তোমায় একটা কথা আমি বলি নি এতক্ষণ। আমি বেশ কিছুদিন হল ভাবছিলেম একবার দেশভ্রমণে বার হই। মনের মত সঙ্গী না পাওয়ায় এতদিন তা ঘটে নি। কিন্তু যখনই দেখলেম তোমাকে, ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেছ কে জানে কোথায়, অমনি আমার মনে হল,—সোজা হয়ে বসে ইঁদুর পাইপটার নল দিয়ে দেখিয়ে বলল,—কাঠবিড়ালি ভাই, চল তোমাতে আমাতে বেরিয়ে পড়ি দেশবিদেশে। চল পেরিয়ে যাই আমরা দেশান্তর। কি হবে মান্ধাতার আমলের এই বাড়ির মধ্যে শুধু এঘর-ওঘর করে? কি হবে মোটা বইগুলোর যত আজগুবি গল্প পড়ে! চাই সত্যিকারের অ্যাড্ভেঞ্চার! বিপদ তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে যাব। অজানাকে জানব। পারবে তা গেছো ইঁদুর! পারবে তা কাঠবিড়ালি! নইলে এই প্রাসাদের দেওয়ালে আমিও একদিন মাত্তর একটা ছবি হয়ে টাঙানো হয়ে থাকব। আর রাশি রাশি ধুলো পড়বে

এসে আমার মুখে! না, আমাদের যেতেই হবে,—বলতে বলতে জ্বল-জ্বলিয়ে চাইল ইঁদুর কাঠবিড়ালির দিকে।

—কিন্তু কোথায় যাব আমরা? আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি। উঠে পড়ল ইঁদুর। দেরাজ খুলে সে বার করে আনল একটা মানচিত্র। সেটা মেলে ধরে দুজনা ঝুঁকে দেখতে লাগল।

ওই যে দেখছ মোটা আঁকাবাঁকা দাগটা, ওই হল আমাদের চেনা বনভূমির সীমানা। ওর ওপারে কি আছে তা কেউ জানে না। কেউ যায় না ওর ওধারে। ওর বিরাট ছায়া চিরদিন ঝুঁকে আছে আমাদের দিকে চেয়ে। ওখানেই আমরা যাব—বলে কাঠবিড়ালির মুখের দিকে ইঁদুর চাইল তীব্র দৃষ্টিতে।

কেন যাব আমরা ওদিকেই?

কারণ,—বললে ইঁদুর গভীর গলায়,—তা না হলে অজানা হয়েই থাকবে যে তা চিরকাল। তাই যাব।



দেওয়াল থেকে একটা ব্যাগ পেড়ে এনে ইঁদুর কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। —কতকাল এই ব্যাগ আমি ভরে রেখেছি ভ্রমণে বেরোবো বলে। এই এতদিনে আমার কাঁধে উঠল। চল ভাই!—বলে আলমারীর কোল থেকে একটা হাতুড়ি বের করল সে। দরজার আড়ালে একটা ঝুলোনো ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘা দিল। অমনি সেই মাটির নীচে মস্ত পুরীর তলগুলো শতসহস্র পায়ের শব্দে ভরে উঠল। হাতুড়িটা তুলে রেখে ইঁদুর বলল,—এস আমার সঙ্গে।

আবার ঘরের পর ঘর, বারান্দার পর বারান্দা পার হয়ে এসে পৌঁছল ওরা এক প্রকাণ্ড জলসা ঘরে। চোখে লাগল এসে দিনের মত উজ্জ্বল আলো। ছাদ থেকে ঝোলান রয়েছে

হাজার মোমবাতির ঝাড় লণ্ঠন। হাজারটা শিখা অতসি কাচের পলকাটা ঝালরের আগায় লেগে ঠিকরে পড়ছে শতধারে। চৌকো চৌকো চিড়েতন-নক্সা কাটা মেঝে ঝকঝক করছে সেই আলোর ধারায়। এককোণে জমকালো রঙিন সাজ-পোষাক পরে বাদ্য-বাজিয়েরা বসে। তারা ঢুকতেই বাজনা বেজে উঠল। আর জলসা-ঘরের আড়া-ছোঁওয়া দরোজা দিয়ে ঢুকল সারবন্দী ইঁদুর মেয়ে-পুরুষেরা। তাদের সাজের কিবা বাহার। কেউ পরেছে লাল মখমলে জরির কাজ করা কোট আর সবুজ ডোরাকাটা ফুলপ্যাণ্ট। কেউ গোলাপী সেরওয়ানী, আচকান, তুর্কি ফেজ। মেয়েরা সেজেছে রঙিন ওড়নায়, ওস্তাদ তাঁতী মাকড়সাকে দিয়ে বানানো। গা ভর্তি গয়না, আলোতে ঝিকমিক করছে। গলায় দুলছিল মুক্তোর মালা, যেন পূর্ণিমায় সাগরের ফেনা উপছে এসে পড়েছে। মেয়ে ইঁদুরেরা আবার মাঝে মাঝে তাদের হাতে ধরা ঝোলায় লুকোনো এক একটা ছোট্ট আরসি বার করে গোঁফগুলো পাট করে নিচ্ছিল। আর অমনি তাদের আঙুলের আংটি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। সবাই অহংকারে মটমট। ভাবখানা—বলত দেখি আমি বেশি সুন্দরী না ওই কালো কুচ্ছিত নেংটে ইঁদুর মেয়েটা!

বাজনা থেমে গেল। তখন সব ইঁদুরেরা পদ্মের কুঁড়ির মত সারে সারে দাঁড়িয়ে মিষ্টি এক গান ধরল। গানের কথা কাঠবিড়ালি বুঝতে পারছিল না। তবে কতকটা এইমত—চিঁক চিঁক, কিঁচ কিঁচ, প্যাঁক প্যাঁক, চ্যাঁক চ্যাঁক—এমনি নানামত মিষ্টি আওয়াজ। কাঠবিড়ালির খুব ভাল লাগছিল। তাই সে চোখ বুঁজে আপনার গোঁফজোড়া মাঝে মাঝে খুব কায়দা করে মোচড়াচ্ছিল।

কখন গান থেমেছে। কিন্তু কাঠবিড়ালি তার গোঁফ মোচড়াচ্ছে ত মোচড়াচ্ছেই! আর মাথা নাড়ছে। হঠাৎ কানে ইঁদুর বন্ধুর মোটা গলার আওয়াজ ঢুকল। চমকে চেয়ে কাঠবিড়ালি দেখল চারিপাশে তার ভীড় করে এগিয়ে এসেছে সেইসব সুদর্শন ইঁদুর মেয়ে-পুরুষেরা।

ইঁদুর তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল অন্যদের দিকে চেয়ে,—সমবেত অনুগত সম্ভ্রান্ত পরম ঐশ্বর্যশালী ইঁদুর ভাইবোনেরা! আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন একজন, যাঁকে পেয়ে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছি।—এই বলে ইঁদুর কাঠবিড়ালির হাত ধরে এক পা এগিয়ে একটু ঝুঁকে অন্য হাত বুকের কাছে ঘুরিয়ে বলল—আমার বন্ধু, শ্রীপাঁচডোরা রঘুবীরদাস কাঠবিড়ালি কাশ্যপ।

অমনি চারিদিক একটা মৃদু গুঞ্জনে ভরে উঠল। ইঁদুর বলে চলল,—আমার বন্ধু এসেছেন অনেক দেশ পেরিয়ে সুদূর চিন্তামণি হ্রদের তীর থেকে···

কাঠবিড়ালি ইঁদুরের কনুইতে একটা চিমটি কেটে ফিসফিসিয়ে বলল, —হ্রদ নয় ইঁদুর ভাই—সে সুন্দর নদী চিন্তামণি। একটু অদ্ভুত তাকিয়ে ইঁদুর বলতে লাগল—চিন্তামণি নদী থেকে···

—আর আমার নাম অতগুলো নয়—মাত্তর কাঠবিড়ালি!—ইঁদুর আবার অদ্ভুত তাকিয়ে বলতে শুরু করল—চিন্তামণি নদী থেকে এসেছেন আমার এই দিগ্বিজয়ী বন্ধু পাঁচডোরা রঘুবীর দাস সুন্দর-বাহার-ল্যাজ কাঠবিড়ালীশ্বর কাশ্যপ! যিনি আজ আমাদের মধ্যে সমাগত, তাঁকে আমরা পেয়ে ধন্য হয়েছি, আমরা কৃতার্থ হয়েছি! আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়েছে, চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, বুদ্ধি প্রদীপ্ত হয়েছে! তিনি সেই দেশের কাঠবিড়ালি যার কীর্তি ইতিহাসের পাতায় পাতায় বাঘা বাঘা অক্ষরে লেখা। সেই বংশের বীরপুরুষ ইনি, যার শৌর্য বীর্য গৌরব···

হঠাৎ কাঠবিড়ালির মুখের দিকে চোখ পড়তে ইঁদুর থেমে গেল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল কাঠবিড়ালির মুখ। তার অমন বাহারে গোঁফ এক্কেবারে ঝুলে পড়েছে, মাথা ঝুঁকে আছে আরও। চারিদিকে সেই অগুণতি ইঁদুর স্ত্রী পুরুষেরা চাইতে লাগল তার দিকে দারুণ ঈর্ষায়। প্রশংসা উপছে পড়ছিল তাদের চোখে। আর মেয়েদের চোখগুলো যেন বারে বারে তার প্রতিটি বাহারে গোঁফ গুণে গুণে দেখছিল! বেচারী কাঠবিড়ালি! একবার সে দিকে তাকাতেই তার

বুকের মধ্যে যেন খানিকটা বনের গরম হাওয়া শোঁ শোঁ করে ছুটে এল! হাঁটু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

ইঁদুর তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে নিল। বলে চলল,—আজ অমি তোমাদের মধ্যে এসেছি, আমার ইঁদুর ভাই বোনেরা—বিদায় নিতে। তোমরা সকলেই জান কতকাল আমি দেশ-ভ্রমণে বার হবার তোরজোড় করছি। অবশেষে সেই শুভলগ্ন এসেছে। এতদিনে ইঁদুরদের প্রিয় নেতা দেশভ্রমণে বার হবে। কালই সে চলে যাবে সেই সব দেশে যার নাম আর ছবি আমার আলমারীর মস্ত মোটা কেতাবগুলোয় লেখা আছে। সেইসব দেশবিদেশ ঘুরে ক—তো ধন ঐশ্বর্য সম্পদ জয় করে ফিরে আসবে গেছো ইঁদুর। আসবেই সে। তাই তোমাদের আমি বিদায় জানাচ্ছি। কালকে ভোরে—না আজ রাত্রেই আমি আর কাঠবিড়ালি চলে যাব অনেক—অনেক—দূর! ততদিন তোমরা শান্তিতে বাস করবে। কেউ মিথ্যে কথা বলবে না—নিন্দে করবে না—কাঁদবে না—মুখ ভ্যাঙাবে না। এইবার তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।—

বক্তৃতা শেষ করে গেছো ইঁদুর অন্য সব ইঁদুরদের সঙ্গে কোলাকুলি করল। কাঠবিড়ালির সঙ্গেও সকলের কোলাকুলি হল। ইঁদুর স্ত্রী-পুরুষেরা জয়ধ্বনি করল। সভা ভঙ্গ হল।





সাত

তখনও সম্বর্ধনা সভার বাজনা ভেসে অসছিল কানে। কিন্তু সে বাজনা ছিল বিদায়ের একটা মিষ্টি করুণ সুরে বাঁধা। তাদের পিছনে দীর্ঘ শুঁড়ি বারান্দার থামে থামে মোমবাতির শিখা স্থির হয়ে জ্বলছিল। ভ্রমণের নেশা তখন দুজনাকে পেয়ে বসেছে। তাদের পা পড়ছে একতালে। ইঁদুরের চোখ দুটো থেকে থেকে জ্বলে উঠছিল, যেমন পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় নিশুত রাতের তারা।

তারা এসে পৌঁছল শেষ দরজাটায়। চাবি ঘুরোল ইঁদুর। শব্দ হল কুট্। বেরিয়ে এল দুজন বাইরে। তখন বন আলো করে চাঁদ উঠেছে। মস্তো চাঁদ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার ঢলো ঢলো মুখখানি চেয়ে দেখছিল ওদের। আলোর প্রকাণ্ড জালে আটকা পড়ে বনের অন্ধকার ভেঙে কুচি কুচি হয়ে গেছে। সাদা আলো মোটা মোটা কালো স্থির গুঁড়িগুলো জড়িয়ে নামছে। জোনাকির রং ফিকে হয়ে গেছে। আর চাঁদ ছোঁওয়া গভীর আকাশের বুক থেকে তারারা মিট মিট করে চাইছিল।

কাঠবিড়ালির মন খুশিতে ভরে উঠল। এগিয়ে চলল ওরা। সামনে বিছিয়ে পড়ে শুকনো পাতার রাশ, তার মাঝে চলে গেছে অজানা অসংখ্য শুঁড়িপথ যা কেবল বনের প্রাণীরাই চিনতে পারে। আর হাওয়া আসছিল গাছের পাতা কাঁপিয়ে—তাতে রাশি রাশি ফুলের গন্ধ। রাতে কুঁড়িরা আস্তে আস্তে জেগে ওঠে, আর পাপড়ি খুলে ঢেলে দেয় গন্ধ। সারারাত সেই গন্ধ কুড়িয়ে নিয়ে বাতাস বয়ে যায় দূর থেকে দূরে, অনেক দূরে। বনফুলদের ফুটে ওঠার খবর পৌঁছে দেয়। কী সুন্দর! ভাবল কাঠবিড়ালি।

সে থাকে নদীতীরে। সেখানে চাঁদ নদীর জলে শুধু নেচে বেড়ায়। কিন্তু এমন ছায়া আর আলোয় রং-ভাগ করা নেই।

কোন দিকে যাবে তারা? নিশুতি রাত্তির গম গম করছে অগুণতি প্রাণীর চলাফেরার শব্দে। কারা দল বেঁধে বেরিয়েছে পাড়া বেড়াতে। আবার কেউ কেউ একলা চুপি চুপি চলেছে। ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি চলতে চলতে এক মস্ত গান্ধারী গাছের তলায় এসে পৌঁছল। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথা অন্ধকার ভরা। হঠাৎ ইঁদুর থমকে দাঁড়াল। গাছের গাঢ় ছায়া থেকে শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে একটা ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছিল। কাঠবিড়ালি কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইঁদুর সাবধান করে শব্দ করল—হি-স্-স্! ছোট ছোট পশু যাদের কাথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল তারা হঠাৎ চুপ করে রইল।

অন্ধকার ছায়াটা দু পায়ে ঘেঁটে থপ থপ করে এগিয়ে এল আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে—এক জন মস্ত চেহারা-অলা জীব। চার পায়ে এক বিঘত লম্বা কাস্তের মত বাঁকা বাঁকা নখ। মুখটা হাউইয়ের মত, কান চোখা চোখা, চোখে বেজায় বিরক্ত চাউনী।

তাকে দেখে ভয়ে কাঠবিড়ালির প্রাণ উবে গেল। তাড়াতাড়ি ইঁদুরের পিছনে লুকিয়ে তার কাঁধের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল সে।

হঠাৎ সেই প্রকাণ্ড ব্যক্তি তাদের দেখতে পেল আর হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে এসে থপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের সামনে,—উ হুহুহু—পথ ছেড়ে দাও!—কম্বলটা আরও জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—পথ ছেড়ে দাও! বেজায় শীত!—বলেই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

বেজায় হাসি পেল কাঠবিড়ালির। দেখ কাণ্ড! আশ্বিন মাস, তায় ধপধপে চাঁদের আলো। এখন কম্বল মুড়ি দিয়ে কেউ কাঁপে নাকি। ইঁদুরের কাঁধের উপর থেকে তাই সে একটু হেসে ফেলল—হি! হি!

চুপ! হিসিয়ে উঠল ইঁদুর,—উনি ভোম্বল কম্বোল শ্যামাদাস ভল্লুক। বেজায় খামখেয়ালী।

খামখেয়ালী?

হুঁ হুঁ! দেখছনা সাজের বহর? জহর কোটের পকেটে উনিশটা ফাউন্টেন পেন আর চোখে চারজোড়া রং বেরঙের চশমা। বেশ খোশ মেজাজে থাকেন। কিন্তু কেউ বলতে পারে না—এক্ষুনি রেগে কাঁই হয়ে উঠতে পারেন। নয়ত বেজায় জ্বর আসতে পারে।

এঃ! এমন আবার কেউ করে নাকি? কাঠবিড়ালির কেমন খাপছাড়া মনে হল ভোম্বল কম্বোলকে। তবু একটু ভাল করে দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে গলা বাড়িয়ে যেই সে প্যাটপ্যাট করে চেয়েছে অমনি বেজায় অখুশি গলায় বলে উঠল ভল্লুক—আঃ! বলছি আমায় পথটা ছেড়ে দিতে তা গেরাহ্যিই করছেনা কোন লোক। আর উনি কে ছুঁচলো মুখো পয়গম্বর? পিট পিট করে চাইছেন অমনতর?' কেন, আমি কি চিড়িয়াখানা—এ্যাঁ? পথ ছাড়ো বলচি—শীতে মরে গেলুম, এট্টুও কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে মান্‌ষের!

ইঁদুর তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়িয়ে বলল,—আমরা ত সরেই দাঁড়িয়েছি পিসেমশাই, আপনি যান না কেন—

অ! আমায় দেখে অমনি সরে দাঁড়ান হল! সব বুঝতে পারি! ভল্লুককে দেখলেই সক্কলে মুখ ফিরিয়ে সরে যায়! সব্বাই তফাতে হাঁটে! পাছে দুটো কথা খরচ করতে হয়। কেন হ্যা বাপু? বলি তোমাদের ভিটে কি সোনার চক বাঁধানো যে এতডা অং'কার হয়েছে?

কি বিপদ! কাঠবিড়ালি এত অভিযোগের কোন কারণই খুঁজে পেল না। ইঁদুর কিন্তু না দমে বলে,উঠল,—আপনি ভুল করছেন পিসেমশাই। সবাই কি আর আপনার সঙ্গে কথা কইবার যুগ্যি? যোগ্যতা থাকা চাই, নইলে আপনার মত সম্মানী লোকের সঙ্গে যে, যে—সে কথা বলে ফেলবে!

ঠিক বলেছো!—খুশিতে উপছে উঠে বলল ভল্লুক। আমি তা'লে একজন খু—উব্ সম্মানী লোক! না কি বল?—এ্যাঁ?

নিশ্চয়ই !!

ম—স্তো সম্মানী?

প্র—কা—ণ্—ড!—হাত দুটো ফাঁক করে ইঁদুর বুঝিয়ে দিল পরিমাণটা।

আহ্লাদ আর ধরে না ভল্লুকের। সে সামনের দু'পা ভেঁজে একটা মস্ত কুণ্ডলীর মত বসে পড়ল ওদের সামনে। কম্বলটা গলায় টেনে জড়িয়ে বললে ইঁদুরের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস করে—

কিন্তু জানো কি ভায়া,—সব্বাই সে কথাটা একদম মানতেই চায় না। আমি পষ্ট শুনতে পাই যেতে যেতে ঝোপ জঙ্গলের মাঝ থেকে কারা বলে,—ওই ভোম্বল কম্বোল যাচ্ছে! শীগ্‌গিরী কম্বোল মুড়ি দে। নয়ত ভাল্‌কো জ্বরে ধরবে!—এ্যাঁ! এ কেমনতর অশিষ্ট কথাবার্তা ওদের?

ইঁদুর তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বলল,—না পিসেমশাই, তেমন জন্তু কি বনের ত্রিসীমানায় থাকতে পারে কিনা আপনার অসম্মান করে?

নেই? বাধা দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল সে,—দস্তুর মতো আছে! তবে আমি গেরাহ্যি করিনে! বলে ভল্লুক দু হাতের বুড়ো আঙুল উঁচু করে দেখাল। চোখোচোখি হয়ে গেল অমনি কাঠবিড়ালির সঙ্গে। উঠে দাঁড়িয়ে এক হাত কোমরে রেখে অনেকক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভল্লুক দেখল চেয়ে।

এ ছেলেটিকে ত কখন দেখিনি এ ধারে? নতুন এয়েচে বুঝি?—জিজ্ঞাসা করল ভল্লুক।

আমার বন্ধু পাঁচডোরা কাঠবিড়ালীশ্বর কাশ্যপ। চিন্তামণি তীর থেকে বনভ্রমণে এসেছেন।

হুঁ হুঁ! চোখ চিকমিক করে তাকাল ভল্লুক।

ইনি বনমুল্লুকে সবাইর সঙ্গে খুব আলাপ করতে চান। পরিচয় করিয়ে বলল ইঁদুর।

তাই না কি? বেশ বেশ বেশ! তা আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব করবে? দুকান অবধি হেসে তাকাল ভল্লুক।

কাঠবিড়ালি তখন তার সবচেয়ে সম্ভ্রমের গলায় একটু কেসে বলল,—নিশ্চয়ই! আপনার সঙ্গে আলাপ হলো এযে আমার পরম সৌভাগ্য! আমি ধন্য হলেম!

ইঃ! বন্ধ চোখ হাট করে খুলে তাকাল ভল্লুক। যেন একটু বুঝতে

পেরে শেষে বলল ফিস্ ফিস্ করে,—ধন্য হলেম! এ্যাঁ! ভারী মিষ্টি কথা ত ছেলেটির! অসী—ম সৌভাগ্য—বাঃ! এরেই বলে সাধুভাষা না—এ্যাঁ? কি বলো ইঁদুর?

হঠাৎ খুশিতে ছলকে উঠে ভল্লুক বলল ঝুঁকে পড়ে,—কিন্তু জানো কি আমার আসল পরিচয়টাই তোমাদের দেওয়া হয় নি এতক্ষণ। আমি যে খুব ভাল নাচতে পারি! তেমন নাচ কেউ দেখেনি। ঘেঁটুফুলের নাচ, কদমকুন্কুনির নাচ, বনডুগডুগির নাচ—সব আমার রপ্ত। রও! তোমাদের এক্ষুনি একটা নাচ দেখাই!—বলে আর সবুর না করে সে হানফান করে বেরিয়ে এল ছায়া থেকে আর বনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁকতে লাগল, —শ্যাল্—ও—শ্যা—ল্! বলি কোথায় আছ—ও—শ্যা—ল্—!

সর্বনাশ করেছে! ফিস্ ফিস্ করে বলল ইঁদুর কাঠবিড়ালির কানে—সর্বনাশ! ভোম্বল ভল্লুক নাচতে শুরু করলে থামবে না।

অনেক দূর থেকে সাড়া এল—ক্যা—হুয়া—যা—আ—ই!! শুকনো পাতা খড়বড় করতে করতে কিছুক্ষণ পরেই এসে হাজির হল শেয়াল।

আরে শীগ্গির্ এসো শ্যাল ভায়া! এই এঁরা এয়েচেন কদ্দূর থেকে আমার নাচ দেখতে। তোমরা তো মানতে চাও না! এখন তোমার শৃগাল রাগিণীটা ধরত, আমি নাচি তার সঙ্গে! ভল্লুক দুপায়ে উঠে চাঁদের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরল নাচের ভঙ্গীতে।

শেয়াল তখন উবু হয়ে বসে আকাশের একটা ঝকঝকে তারা বেছে সেই দিকে তার ছুঁচলো মুখটা উঁচিয়ে ধরে তান ধরল—

—ওঁ আউ আউ আউ
হুক্কা হু—আউ আউ আউ—

অমনি ভালুক থুমুক থুমুক করে নাচতে আরম্ভ করল। ওঃ! সে কি নাচ! তার মস্ত কম্বলটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল সন্যিসীদের জটার মত। সাদা দাঁতের পাটি ঝকমক করতে লাগল, ঢেউয়ের সাদা চূড়োয় চাঁদের আলো চমকে ওঠার মত। চারিদিকে রিমঝিম করছে বনের রাত। জোনাকি জ্বলছে ধিপ্‌ধিপিয়ে। থরথর কাঁপছে সদ্য পড়া শিশিরের ফোঁটা পাতায় পাতায়।

ভালুক নেচে চলেছে একটানা। আর চাঁদের বুড়ি আকাশের সান্‌কিতে চেপে তাই দেখে হেসেই কুটোপাটি—

ভালুক নাচে ভালুক নাচে
দুপুর রাতে ঝাঁঝর বাজে—

হঠাৎ একপাশ থেকে ডালপালা সরিয়ে মস্তো একখানা মুখ উঁকি দিল। বললে হেঁড়ে গলায়,—বলি ভাল্‌কো! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই রাত দুপুরে কয়েকটা আধবয়সী ছোকরার সামনে ধিন্‌তা ধিনা নাচছিস্‌?

চমকে সবাই তাকাল সে দিকে। দেখল প্রকাণ্ড একখানা হাঁড়িপানা ডাবর মুখ ঝোপের মধ্যে থেকে কটমটিয়ে চাইছে। তাল কেটে গেল। ভালুক নাচ থামাতে বাধ্য হয়ে চটে উঠে তাকাল ফিরে। তখন ঝোপের আড়াল থেকে আগন্তুক বেরিয়ে এল। কাঠবিড়ালি দেখল সেও বেশ সাজোয়ান দেখতে একজন দস্তুর জন্তু। ভল্লুকেরই মতই, তবে আরও নীরেট। পেটটা নাদা, কাঁধে খোঁচা খোঁচা শরকাঠি। দুটো ভয়াল দাঁত খাই মুখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে কুটিলভাবে বেঁকেছে। চোখ দুটো অসম্ভব ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু একরোখা তার ভাব। ইঁদুর ফিস্‌ফিস করে বলল,—ইনিই বরাহমিশির তেওয়ারী। গণিতে ওঁর ভয়ানক দখল।—হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধমকে বনের গাছপালা ইস্তক সকলের পেটের পিলে চমকে উঠল,

—বেরসিক কাঁহাকার! অপমানিক বুনোশোর! এমন খাসা নাচটার তাল বাজেয়াপ্ত করলি তুই?

করবো না?—শরকাঠি ঝেড়ে বলল বরাহমিশির। ডাকনাম শুনে রাগে তার চোখ দুটো গন্ধকের মত জ্বলে উঠল,—তুই খামোখা নাচবি কেন র‍্যা?

তোর মত বুনোশো'রের তাতে কি?

ফের বুনোশোর বলচিস্‌?

ঝগড়াটা হয়ত আরও গড়াত। কিন্তু শেয়াল এসে তখনই মধ্যস্থতা করে বলল,—তোমরা আদপেই ভুল করেছো। আমি যে রাগিণীটা ধরেছিনু তাতে যে না নেচে থাকতেই পারে না কেউ। মিশির, তুমি সমঝে কথা বলো নি।

তার মানে ?—হেঁয়ালিতে চটে উঠে বলল বরাহমিশির।

তার মানে আমার গান শুনে নাচবে এ তো সহজ কথা। ভালুক কেন তুমোও নাচবে!

খবরদার! ছেলে ছোকরাদের সামনে মস্করা করিস্ নি! আমি কি ভাল্কোর মত পাগল ?

কি বললি পেটডাগরা শোর!—গালি শুনে আবার তেড়িবেড়ি করে উঠল ভাল্লুক।

না না, বলছে কি তুমি গান পাগ্‌লা লোক কিনা! —শেয়াল তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল।



এমন সময় দাক্ষিণ থেকে একটা হাওয়া বয়ে এল মিষ্টি গন্ধে ভরপুর হয়ে। অমনি ভল্লুক তার ছুঁচলো নাকটা সেদিকে তুলে ধরে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে বলল,—আঃ! বুনোশূয়োর তার হাঁড়িপানা মুখটা যতটা সম্ভব উঁচিয়ে নাকটাকে বাটির মত মেলে ধরল হাওয়ায়। এক পেট হাওয়া টেনে বলল,—আঃ! ভল্লুক যেন আপন মনেই বলল,—অমৃত ফলগুলো তা'লে পাক্‌লো এ্যাদ্দিনে!

বুনোশূয়োর মনে ননে অঙ্ক কযে চোখ বুঁজে থেকে বলল,—মাটির অন্ধকার তলায় শেকড়-গুলো কি রসেতেই ফেটে পড়ল আহা! ভল্লুক আবৃত্তি করল,—মৌমাছিদের চাকে যে মধু উপছে প'ল! বুনোশূয়োর গেয়ে উঠল—ক্ষেত ভরা ভুট্টা বুঝি পেকেই সারা হল! ছটফট করে উঠল ভল্লুক,—তবে আর না! ওরে শ্যাল! চ' শীগ্‌গিরী! ওফ্‌! কি খিদেই পেয়েছে! কত্থক নাচ নেচে খিদেয় পেট চাঁই চাঁই করছে। ওই শোন্‌! গন্ধ ভেসে আসছে যত মিষ্টি ফল ফুল মৌচাক আর পাতালকোঁড়ের দেশ থেকে, দখ্‌নে হাওয়ায় তারই খবর সটাং আমার জিভে এসে ঠেকেছে। ওরে শোর্‌ চ শীগ্‌গির, খিদেয় ম'লুম!

—ফের শোর বলচিস্ বোম্বেটে! এক চোখ কটমটিয়ে চাইল বনোশূয়োর ভাল্লুকের দিকে। কিন্তু অন্য চোখে তার ছড়িয়ে পড়েছিল একটা অত্যন্ত জ্ঞানী ভাব। বললে,—সত্যি বলছি ভাল্কো, ওসব শিল্পতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা মোট্টেই আমাদের কর্ম নয়। আমাদের জন্যে হল—ক্ষেতভরা শস্য ফুটি কাঁকুড় আর ভুট্টা। বুঝেচিস্?

খাঁটি কথা ভাই! জবাব দিল ভল্লুক। তারপর বুনোশূয়োরের কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল,—দেখ, এরপর তোতে আমাতে পণ্ডিত দেখতে পেলেই এমন দাঁত দেখিয়ে দোব—

যে ছুট্টে পালিয়ে যাবে!—লাফ দিয়ে উঠে বলল বুনোশূয়োর।

হা! হা! হা! হেসে উঠল শেয়াল।

হা হা হা!—হা হা হা!—, ভীষণ হাসাহাসি করতে করতে দুজনা এসে খপ্ করে শেয়ালের কোমর জড়িয়ে ধরে গলাগলি হয়ে দাঁড়াল।

তখন একটা দক্ষিণে হাওয়া বন উতল করে বয়ে এল। চাঁদের জরির সূতোগুলো কেঁপে উঠল সে হাওয়ায় আর টান লেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল পাতা। ফিসফিসে আওয়াজে ভরে উঠল চারিদিক। কিন্তু চাঁদ তাকিয়ে রইল স্থির।

তিনজন, ভোম্বল ভল্লুক, বরাহমিশির আর খ্যাঁকশেয়াল থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ পা ফেলে ছুট দিল দক্ষিণে হাওয়ার হদিস ধরে। তাদের পায়ের আওয়াজ শুকনো পাতা ভাঙতে ভাঙতে মিলিয়ে গেল অনে—ক দূরে।

আট

ইস ! বলে উঠল কাঠবিড়ালি একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে। কী বিষম পাগল !—বলল ইঁদুর।

বনের পথঘাট পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। চাঁদ তখন পূব আকাশের কোল থেকে একটা মস্ত নক্ষত্র তাক করে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

এইবার, ভাবল কাঠবিড়ালি—এইবার সত্যি সত্যি বনের অফুরন্ত রাজ্য শুরু। এইবার সত্যিকারের ভ্রমণের পালা। ঘুম চোখের পাতা থেকে পালিয়ে গেছে চিরতরে। এখন তার সঙ্গী গেছো ইঁদুর। কত অল্পক্ষণেরই না তাদের আলাপ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত যুগের চেনা। অবশ্য কাঠবিড়ালিদের যুগ তত লম্বা নয়। যখন সূর্যদেব আঁধার ভেঙে রোজ ওঠেন কাঠবিড়ালির মনে হয় সেই ভোর বেলাতেই নতুন একটা যুগ আরম্ভ হল। আবার সাঁঝবেলা একরাশ লাল অস্ত ফাগ্ ছড়িয়ে তিনি চলে গেলে, যখন একের পর এক তারাদের দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ে তখনই শেষ হয়ে যায় যুগটা।

এখন কোনদিকে যাবে? সোজা পশ্চিম মুখো তারা এগোবে। বলল ইঁদুর। কারণ সে দিকটা তার অজ্ঞাত। সে দিকেই চাঁদ আর তারারা পাড়ি দেয়। সে দিকেই ঘন গভীর অরণ্যের ছায়াটানা পর্দাটা আড়াল করে থাকে যা কিছু অজ্ঞাত।

তাই তারা চলেছিল অনেকক্ষণ। বনের ভিতর এক জায়গায় অনেকগুলো অল্পবয়সী গাছ ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের থেকে কিছু আগে একটা গাছের গুঁড়িতে কে একজন মই লাগিয়ে উঠে মস্ত একখানা কাগজ লাগাচ্ছে। একহাতে তার আঠার টিন ; বগলে

পাকানো এক বাণ্ডিল কাগজ। কাগজটা এদিক ওদিক ভাল করে সেঁটে তরতর করে নেমে এল, তারপর কাঁধে মইটা তুলে নিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল। বরাবর মুখ ফিরিয়েই ছিল সে, বা এত বেশী আনমনা ছিল যে কাঠ-বিড়ালিদের দেখতেই পেলনা। ওরা এগিয়ে এসে দেখল কাগজে বড় বড় হরফে লেখা—

অদ্য বেলা দুপুর রাত্রিতে

পশুজন সভা!

স্থান ঃ মাঠ-জঙ্গল পাড়া

দলে দলে সমবেত হউন!

কিসের সভা ইঁদুর ভাই?—জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি। যে মই কাঁধে হনহনিয়ে চলেছিল আগে সে থমকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ওরা দেখল ওর মস্ত বড়ো খাড়া কান আর কালো জামের মত চোখ। বেশ ভব্য-সব্য বাবুটি একজন। গায়ে লাল টুকটুকে খেলুড়েদের কোট, পায় গোল গোল বুট জুতো। ইঁদুর বলল নীচু গলায়,—উনি খরগোস খাড়াকর্ণ দাসঘোষ বর্মা। বেজায় ব্যস্তবাগীশ ভদ্রলোক। সমাজ-সেবা কর্ম।

—চল না। একটু আলাপ করি।—বলল কাঠবিড়ালি। বনের রাজ্যে ঢুকে কেবলই নিত্যনূতন লোকের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। তারা দুজন পা চালিয়ে কাছাকাছি হতেই অন্যজন ঘাড় না ফিরিয়েই বলে উঠল,—উঁহু! আমি গল্প করতে পারব না। ভাবতেও পারব না। এমনকি তোমাদেরকে নস্যিও দিতে পারব না। দেখছ না কি কাজের লোক আমি!—আরও জোরে হনহনিয়ে সে হাঁটা শুরু করল।

এঃ! বড্ড অহংকারী লোকটা দেখেছ? কে সেধে কথা বলতে চায়! ভীষণ রাগ করে ভাবল কাঠবিড়ালি। কিন্তু কি এমন রাজকার্যে চলেছেন যে কথা কইবেন না? জিজ্ঞাসা করল সে ইঁদুরকে।

—দেখছ না বগল ভর্তি নথিপত্তর? নিশ্চয়ই সভা সমিতি বা ওইমত

কিছু। থাকেন তেপান্তর পাড়ায়। : কিন্তু দিনরাত কেবল টো টো করে মিটিং আর মিটিং।

কাঠবিড়ালির রাগ তবু পড়ল না। সে ঠিক করল দৌড়ে গিয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়াবে। কিন্তু যেই না সে ছুটে ওর কাছাকাছি এসেছে চক্ষের পলকে খরগোস্ কোথায় মিলিয়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাঠবিড়ালি চাইতে লাগল চারিদিকে।

—হয়েছে ত? বললুম, আমার সময় নেই। যেমন শোনোনি কেমন বোকা হলে?—খানিক দূরে মই কাঁধে দাঁড়িয়ে খরগোস্ মিটমিট করে দেখছিল ওদের।

ঠিক বলেছে ও!—হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল ইঁদুর। তুমি ত জান না রোজ ইস্কুল পালাত ও। তাই ছুটে পালানোয় ওর জুড়ি নেই!

এ্যাঁ! আমার নামে মিথ্যে অপবাদ রটানো হচ্ছে—? চোখ গুলি গুলি করে বলল খরগোস,—আমি বলে না পড়াশুনোয় কেলাসে সেরা ছিলাম!—তার কথা না ফুরোতেই ইঁদুর অমনি দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল। বলল,—দৌড়োনোয় আর ফাঁকি দেওয়ায়! কোথায় চলেছ এখন খরগোস্ ভাই?

বুদ্ধিতে অবশ্য খরগোস্ একটু মোটার দিকেই। ইঁদুরের চালাকী বুঝতে না পেরে বলল খুব ব্যস্তবাগীশ ভঙ্গীতে,—আর ভাই আমার কি এট্টুও অবসর আছে? এই আজকেই মাঠ-জঙ্গল পাড়ায় ওরা মিটিং ডেকেছে। আমাকে নাকি পেসিডেন্ট করবে ওরা। আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই মোটেই—তবু সমাজে থাকতে হলে দায়িত্ব নিতেই হবে। একেই ত আমার এত বড় সংসারের তদারকি করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়—তার ওপর আমি একশ উননব্বইটা সমিতির পেসিডেন্ট এর মধ্যেই হয়েছি জানো নিশ্চয়ই?—বলে হাসিহাসি গাল ফুলিয়ে চেয়ে রইল খরগোস। হঠাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল,—জানো কি, সকলে ধরেছে, সামনের বছর বড়জঙ্গল সভায় আমাকে নাকি মেম্বর করে সবাই পাঠাতে চায়। সবার মতে নাকি আমার চে' কেউ ভাল জীব এ তল্লাটে নেই! আমার কিন্তু এ-ট্টু ও ইচ্ছে নেই!—খুশিতে আটখানা হয়ে

খরগোস একটা আধুলির মত হাঁ করে হাসতে লাগল। তারপর একটা গাছের দিকে ছুটে গিয়ে মইটা লাগিয়ে তরতর করে উঠে গেল। একটা নোটিস বগল থেকে নিয়ে সাঁটতে লাগল গুঁড়িতে।



—এ আবার কেমনতর পেসিডেণ্ট ? কাঠবিড়ালি ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল ইঁদুরকে। সভার নোটিস নিজেই টাঙাচ্ছে।

চুপ! ইসারায় নিষেধ করল ইঁদুর।

নোটিসটা লাগানো হলে নেমে এসে খরগোস কাঠবিড়ালির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন সে এই প্রথম দেখতে পেল ওকে। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে সন্দেহ সন্দেহ ভাবে বলল,—তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে বললে না ত ?

আমরা দুজন দেশভ্রমণে চলেছি। বলল ইঁদুর। খরগোস কথাটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল,—অ! দেশভ্রমণে বেরিয়েছ ? কদ্দুর যাবে ?

যতদূর চোখ যায়!

খরগোস এগিয়ে এসে ওদের চোখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চাইল। বলল খুব গলা নামিয়ে,—ওই সুন্দরী বনের দিকে যাচ্ছ বুঝি ?

আরো—ও দূর!

পিয়ালচুর বনে ?

আরও অনে—ক দূর!

বলো না! তোমরা তা হলে ঠিক সোনাঝুরী জঙ্গলে যাচ্ছ!

ধ্যুৎ! দেশভ্রমণ মানে যেখানে কেউ যায় না সেখানেই যাওয়া। যেদিকে খুশি—বা যে দিকে একটুও ইচ্ছে নেই। —বিরক্ত হয়ে বলল ইঁদুর!

খরগোস তাদের মাথার ওপর তিন হাত লাফিয়ে উঠে বলল,—বুঝেছি! বাবা আমার চোখে ধুলো দেবে ? তোমরা নিশ্চয়ই সজারুদের

পাড়ায় মিটিংয়ে যাচ্ছ ! না—ঘাড় নাড়লে আমি শুনবোই না ! কিন্তু যেখানেই যাও না ভাই আমাদের সভায় একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যেতেই হবে ! এই বলে ইঁদুরের কানের কাছে মুখটা এনে বলল,—আর বুঝলে ত, আমায় ওরা পেসিডেণ্ট করবে, দেখেও যেতে পারবে ! হ্যাঁ রথ-দেখা-কলা-বেচা নাকি—হ্যা ! হ্যা ! হ্যা ! বলে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল খরগোস।

কথা বলতে বলতে ওরা এসে পড়েছিল গোল মত একটা ফাঁকা জায়গায়। চারিদিকে লম্বা উঁচু উঁচু গাছ ঘিরে একটা মণ্ডপের মত জায়গা। ধপ্ ধপ্ করছে চাঁদের আলোয়। সেই মণ্ডপে গিজ-গিজ করছে জীবজন্তু।

তারা এগিয়ে আসতেই সকলে একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চাইল। নানা জাতের প্রাণী জমা হয়েছে সেখানে। কাঠবিড়ালি দেখল একেবারে দক্ষিণ দিকটায় দাঁড়িয়ে জনা তিন চার বুনো ছাগল। বড় বড় দাড়ি নেড়ে সবতাতেই হাঁ হুঁ দিচ্ছে। তারপর প্রকাণ্ড শিংঅলা শিক্ষিত চেহারার জনকয়েক বনের মহিষ। তাদের পাশে সম্বর, চিতল, বেজী, গোসাপ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়িয়া নীলগাই, আরও অনেক প্রাণী যাদের জাতি বা ভাষার কাঠবিড়ালি বুঝতে পারল না। খরগোসকে দেখেই সকলে খুব উৎসাহের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো,—এই যে, খাড়াকর্ণ এসে গেছে। সভার কাজ শুরু কর তাড়াতাড়ি।

খরগোস ওদের নিয়ে একপাশে চুপটি করে বসে পড়ল। জটলার অন্য কোণ থেকে হঠাৎ একটা খুব তর্কাতর্কি গোলমালের আওয়াজ শোনা গেল,— 'আগে কাজের কথা শুনতে চাই !' 'কাজের কথাই ত হচ্ছে বাপু !' 'কিস্সু হচ্ছে না' '—ছিকেয় তোলা গে'—এমনি সব টুকরো কথাবার্তা। কাঠবিড়ালি গলা উঁচু করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল চুপি চুপি,—কি কাজের কথা এখানে আলোচনা করছে সবাই ?

আমার মনে হয় সবাই একটা খুব আপত্তি করবে।—বলল ইঁদুর।

কিসের আপত্তি ?

আপত্তি—সব কিছুরই ! ধর বুনোছাগলেরা অনেকদিন আপত্তি করছে তাদের বাড়িঘরদোর কেন তৈরী হচ্ছে না। মোষেদের আপত্তি তাদের কোন

পার্কের ব্যবস্থা নেই। নীলগাইয়েরা বিনা মাশুলে দেশভ্রমণ করতে চায় গাড়ি চড়ে। বেজীদের আপত্তি তাদের পাড়া দিয়ে কেন পেঁচারা ঘোরাফেরা করে।

বাঃ! তা করবে না কেন? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি। —আর বন ত সকলেরই। এ আপত্তি করা খুব অন্যায়।

তা হলেও, আপত্তি একটা না থাকলে মীমাংসাই বা হবে কিসের?— বুঝিয়ে বলল ইঁদুর।

কাঠবিড়ালি বুঝতে পারল না। উপরন্তু ব্যাপারটা তার কাছে আরও বেশী ঘোলাটে ঠেকল। আপত্তি হলে পরেই মীমাংসা—আবার মীমাংসা করতে গেলে আরও আপত্তি। তাই তো!—আচ্ছা দুটো সাপ যদি পরস্পরের ল্যাজ থেকে গিলতে শুরু করে তাহলে দুটোই দুটোকে খেয়ে ফেলে। কি থাকে পড়ে—এ্যাঁ? ভাবতে ভাবতে কাঠবিড়ালি মাথা চুলকোতে শুরু করল।

এমন সময় ছুঁচলো মুখো টিকটিকি সকলকে টিক্ টিক্ করে হুঁশিয়ার করে হেঁকে বলল,—বন্ধুগণ, এইবার আপনারা সকলে চুপটি করে বসুন! এইবার এক্ষুনি সভার কাজ শুরু হবে!

অমনি একজন গোসাপ তাড়াতাড়ি গলা উঁচু করে বলল,—আমি সর্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব . . .

যাঃ! এখন কি! গোসাপটা একেবারে বোকা! সভাই আরম্ভ হয় নি আর সাততাড়াতাড়ি ও সমর্থন করে বসল। এই! বসে পড়্ শীগ্ গির—! চারিদিক থেকে ধমক দিয়ে উঠল সবাই। বেচারী গোসাপ লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তখন একটা উঁচু কাঠের গুঁড়ি—যেটাকে মঞ্চ ঠিক করা হয়েছিল— সেখানে উঠে এল একজন মস্ত নাকঅলা কাকাতুয়া। সে ডানা দুটো পিছনে এঁটে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

বন্ধুগণ! মাঠজঙ্গল পাড়ার পশুপক্ষিগণ! আজ সবাই এই সভাতে আপনারা এসেছেন, সবাই আজ দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন! সবাই অনেক পথ

হেঁটে সাঁতরে বা উড়ে আপনারা এসেছেন! আপনারা এসেছেন কেউ উত্তর থেকে, কেউ দক্ষিণ থেকে, আপনারা এসেছেন কেউ ওপর থেকে কেউ নীচে থেকে। আপনারা কেউ পেট ভরে খেয়ে এসেছেন, কেউ আসেননি। কেউ আপনারা এসেই সভায় ঘুমিয়ে পড়েছেন কেউ ঘুমোননি। কিন্তু আপনারা কি কেউ জানেন কেন আজ আপনারা এই সভায় এসেছেন —?

না—এট্টুও জানিনা—! সবাই একসঙ্গে গর্জে জবাব দিল।

ঠিক্! বলল কাকাতুয়া! আমিও জানিনা!—বলে সে বসে পড়ল।

সাধু! সাধু! চারিদিক হাততালিতে ফেটে পড়ল। এমন সময় কে একজন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—ভোট! ভোট নেওয়া হোক কাকাতুয়ার প্রস্তাবের ওপর।

অমনি সভার মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল—ভোট! ভোট! আমরা ভোটের কথা মানব! ভোট নেওয়া হোক কাকাতুয়া ভাইয়ের ওপর!

তখন বেজী উঠে গিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে বলল,—চুপ করুন! চুপ করুন সকলে! কাকাতুয়া ভাই একটা বিষম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সভায় এনেছে। বন্ধুগণ! আপনারা যে যেখানে আছেন কাকাতুয়া ভাইয়ের প্রস্তাব গভীর ভাবে বিবেচনা করে—এ্যাঁ—উপলব্ধি করে—উঁহু—হৃদয়ঙ্গম করে তবেই আপনাদের রায় দেবেন। আপনাদের রায়, আপনাদের নির্দেশ, আপনাদের আদেশ, আপনাদের ফরমায়েসের উপর আমাদের চিন্তা-পন্থা-সংকল্প-বিকল্প আন্দোলন সম্মেলন স—ব নির্ভর করছে!

বেজী নীচু হয়ে চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা এঁটে নিল, তারপর একটা মস্ত কাগজের বাণ্ডিল ঘাঁটতে লাগল। গোসাপ এতক্ষণ গুঁড়ির পাশে ল্যাজে মুখ লুকিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। বেজীকে চশমা আঁটতে দেখে সে তাড়াতাড়ি মঞ্চের গা বেয়ে উঠে লম্বা গলা তুলে ধরে বলতে শুরু করল—'আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে—'

অমনি চারিধার থেকে সকলে আবার হিসিয়ে উঠল,—এই চুপ কর! যাঃ এখন নয়—বেজী শোলোকটা পড়লে পরে তবেই না,—বসে পড়্ শীগ্গির।

তাই শুনে চশমা চোখে বেজী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঝুঁকে কুট্ করে গোসাপের কান কামড়ে দিল।

উঃ! লাগে! বলে গোসাপ তাড়াতাড়ি নেমে এসে আবার ল্যাজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ঘুমোতে শুরু করল।

বেজী তখন এক হাতে একখানা কাগজ উঁচিয়ে ধরে বলল,—এখন ভোট নেওয়া হবে। কাকাতুয়া ভাইয়ের প্রস্তাবের স্বপক্ষে যাঁরা হাত তুলুন।

অমনি সবাই এক সঙ্গে কেউ একটা করে কেউ দুটো করে হাত তুলে ধরল। বেজী গুনতি করে কাগজে টুকলো—স্বপক্ষে ১৩১ জন।

—এবার বিপক্ষে যাঁরা হাত তুলুন!

আগের মত এবারও সবাই সবকটা হাত তুলে ধরল। একজন সারস এক পায়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুদে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে যেতে সে তার লম্বা গলা উঁচিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই তার গলাটাও গোনা হয়ে গেল। বেজী সব গুণে শেষ করে বলল—বিপক্ষে ভোট ১৮১ জন। অতএব কাকাতুয়া ভাইয়ের প্রস্তাব ৪১ ভোটে বাতিল বলে গ্রাহ্য হল।

কাকাতুয়া তাই না শুনে রাগে গস্‌গস্ করে বলল,—তার মানে?

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—বাঃ! তা কি করে হয়—৩১ বেশী না ৪১ বেশী? বললেই হল! মিথ্যে কথা! জোচ্চুরী! ধাপ্পাবাজী চলবে না! ভোটের জুলুম মানব না!···

সুর করে শোলোক আউড়ে তারা বিষম হট্টগোল আরম্ভ করল। বুনো ছাগল বিষম উত্তেজিত হয়ে পিছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে উঠে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল সবাইকে। কিন্তু তাই দেখে নীল গাই ভীড় ঠেলে সেখানে এগিয়ে গেল, আর চীৎকারে বন মাথায় করে তর্ক জুড়ে দিল। তিনটে হরিণ ভীড়ের কিনারায় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে শুনছিল—হঠাৎ এক দঙ্গল শালিখ পাখি এসে তাদের শিংয়ের ডালপালায় ছড়িয়ে বসল আর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ভীষণ হাসাহাসি করতে লাগল।

কাঠবিড়ালি আর ইঁদুর ত ব্যাপার দেখে হেসেই কুটোপাটি। খরগোস

এতক্ষণ চুপটি করে বসে সভার কাজকর্ম নিরীক্ষণ করছিল। তার আশা ছিল অন্যরকম, উদ্দেশ্যও ছিল আলাদা। কিন্তু যখন দেখল সকলেই বাকবিতণ্ডা করছে, সকলেই চোখ পাকাচ্ছে, শাসাচ্ছে আর তার কথা ভুলেই গেছে—সে আর থাকতে পারল না। হঠাৎ একছুট দিয়ে গুঁড়িটার উপরে উঠে দাঁড়াল আর চীৎকার করে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল,—বন্ধুগণ! মাঠজঙ্গল পাড়ার ভাই ভগিনীগণ! সভার পেসিডেন্ট এইবার কথা বলছেন। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন! বন্ধুগণ! সভার পেসিডেন্ট এবার একটা বেজায় মজার কথা বলবেন—আপনারা লক্ষ্মীটি শুনুন এট্টু! বন্ধুগণ, সভার পেসিডেন্ট এইবার একটা ভয়ানক আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাবেন—আপনারা সক্কলে চোখ বুঁজুন একবার—

মঞ্চের উপরে এইভাবে হঠাৎ হাঁকডাক হওয়াতে সকলে তর্ক থামিয়ে চাইল সেইদিকে। গোলমাল থেমে গেল। খরগোস তখন তার জামের মত কুচকুচে চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল,—বন্ধুগণ সভার পেসিডেন্ট এইবার একটা প্রস্তাব আপনাদের কাছে তুলেছেন—আপনারা—

হঠাৎ একটা মোটা ভারী বেয়াড়া বিষম কর্কশ হেঁড়ে গলা ঠিকরে পড়ল মঞ্চের ঠিক নীচেয়—

এইয়ো! কোন পেসিডেন্ট হ্যায়? কে তোমায় পেসিডণ্ট করেছে? ভাগ্! পেসিডেন্ট আমি। ম্যাজিক দেখাবো আমি! তুই কে র‍্যা?

বলতে বলতে হাঁচোর পাঁচোর করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মঞ্চে উঠে এল ইয়া হোঁৎকা একজন পৌঢ় সোনা ব্যাং। তার চেহারা দুবৃত্তজনোচিত। মাথাভরা টাকের নীচে কোঁকড়ানো চুলের কেয়ারী গোল করা। ওপর দিকে কলপ দেওয়া। চোখ দুটো অল্পভাজা রসবড়ার মত কড়াই ভরা ঘি থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে চারিদিকে। খাই মুখ প্রকাণ্ড। হাঁ করলে চোখ নাক কান সব আড়াল হয়ে যায়। গলা বন্ধ কালোকোট হাঁটু অবধি ঢেকে পেটের কাছটা বিষম ফেঁপে আছে। ঠেঁটো কাপড় পরনে, হাফ্ মোজা গুপো গুপো পায়ের ডিম ঢেকে, তালতলার চটিতে পায়ের পাতা লুকানো। মস্ত কোমরে একটা রং জ্বলে যাওয়া আলোয়ান গেরো দিয়ে আটকানো।

বেচারী খরগোস ত এই নতুন হবু প্রেসিডেন্টকে দেখে মুখ চুন করে ফেলল। চোখ ছল ছল করতে লাগল। একটা কি বলবো বলবো করে শুধু আধখানা হাঁ করে রইল।

ঠকাস্ করে লাঠি ঠুকে সোনাব্যাং এগিয়ে এল তার দিকে। রসবড়া চোখ পাকিয়ে বলল,—ক্যাবলাকান্ত তরফদার! প্যালারাম চৌধুরী! নকড়ি জিবে গজা! তুমি হবে পেসিডেন্ট! ওল বনে ঝিঙ্গে সর্দার! তোর সাহস ত কম নয়!

খরগোসের কাঁদতেই শুধু বাকি। সোনাব্যাঙের কুৎসিত গালফোলা গুলিকারী চোখের দিকে তাকিয়ে বললে গাবু গাবু গলায়,—আমি যে একশ' ঊননব্বইটা সমিতির পেসিডেন্ট হয়েছি। আরেট্টা হলেই দুশো হবে কিন্তু—!



শুনে সোনাব্যাং রাগে কাঁইহয়ে মুখ ব্যাদান করল। দুচোখ তার গরম কড়াইয়ে পান্তোয়ার মত টগবগিয়ে ফুটে উঠল। তারপর তেমনি তাকিয়ে থেকে বলল নিমপাতা সেদ্ধ গলায়,—খোদার ওপর খোদকারী করবি রে বেটা! দেখচিস্ নে পেসিডেণ্টের মত বিলক্ষণ কেবল আমাকেই মানায়!—বলেই সভার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখে কালো চশমা এঁটে বক্তৃতা শুরু করল সেঃ

—বন্ধুগণ! মাঠ জঙ্গল পাড়ার মহান ভ্রাতৃবৃন্দ! আজি এক মহান দিনে আমরা এখানে সমবেত হয়েচি। আজিকার এই পুণ্যতিথিতে মাঠ জঙ্গল ঝোপঝাড় ঘেঁটুবন কচুবন থেকে দলে দলে আপনারা এয়েচেন। আপনারা এয়েচেন দূর দূরান্ত থেকে—সূর্য চন্দ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বেগ হার মানিয়ে (সাধু! সাধু! আর হাততালি) আপনারা এয়েচেন কত পরিশ্রম করে কত পা ব্যথা কত ডানা ব্যথা করে…আপনারা এয়েচেন শুধু একটি চিন্তা মনে করে একটি স্বপ্ন একটি ভরসা সম্বল করে। সেই

আশা—সেই ভরসা,—এতদূর বলে সোনাব্যাং হঠাৎ বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। তারপর ছু কোমরে গুপো গুপো হাতের মুঠো রেখে গলার আওয়াজ সপ্তমে চড়িয়ে হাঁকল,—সে স্বপ্ন—সে আশা—কী!! বলেই মুখ সপাটে বন্ধ করে মোটা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে চাইতে লাগল চারিদিকে।

কি? কি?—সত্যিই তো! সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া—চায়ি করতে লাগল। এককোণে দাঁড়িয়ে এক হাড়গিলে আর সারস গলা জড়াজড়ি করে কেঁদেই খুন। সোনাব্যাঙের বক্তৃতায় বেসামাল হয়ে পড়েছিল বেচারীরা। কাঠবিড়ালির কিন্তু মোটেই ভাল লাগছিল না ব্যাপারটা। সে বলল ইঁদুরের কানে কানে—ইঁদুর ভাই, আমার মনে হচ্ছে সোনাব্যাং ভয়ানক খারাপ লোক।

ইঁদুর বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। অনেকে বলে ও রাজার তরফে ঘোরা ফেরা করে।

তাই বুঝি?—বলল কাঠবিড়ালি। আবার সোনাব্যাঙের ভরাট গলা শোনা গেল—সেই কেবল একটি ভরসা নিয়ে আপনার এয়েচেন। মাঠ জঙ্গল পাড়ার বন্ধু গণ—আপনাদের চাই—একজন নেতা!!

বাজের মত কথাটা ঠিকরে পড়ল। একেবারে চুপ হয়ে গেল সভাস্থল। তারপরেই হাততালি আর সাধু! সাধু! বলে লাফিয়ে উঠল সবাই। সবাই আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে গেল, থৈ থৈ করে নৃত্য করতে শুরু করে দিল। নেতা! নেতা! একজন নেতা! ইস্ কি মজা!

এক হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে ইসারা করল সোনাব্যাং। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে ভীষণ আস্তে গলায় বলল,—কিন্তু কে সেই নেতা?…অর্থাৎ বন্ধুগণ—মাঠ জঙ্গল পরিষদের কে হবে পেসিডেন্ট?

সোনাব্যাং মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসতে লাগল। সবাই ভাবতে লাগল, তাইত কে তাদের পেসিডেন্ট হবে। ভেবে ভেবে কূল পেল না কেউ। সোনাব্যাঙের গলা শোনা গেল—যেমন শ্রাবণ রাত্তিরের ঘুটঘুটেয় তার গলা শুনতে পাওয়া যায়, বললে গভীর স্বরে—বন্ধুগণ! তাকান ইদিকে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এই যিনি,— বলে লাঠিটা খরগোসের দিকে দেখিয়ে বলল—এঁর নাকি

পেসিডেন্ট হবার বেজায় সখ্! বন্ধুগণ, এই ব্যক্তির চোখের দিকে তাকান,—দেখবেন চক্ষু-লজ্জা একটুও নেই! ওর কাণের দিকে তাকান—দেখবেন কাণমলা খেয়ে খেয়ে ওর দুকাণ কত লম্বা হয়ে গেছে। আর ওর সাহসের একটি মাত্র পরিচয়ই ও আজ দেবে—আপনারা তাকিয়ে থাকুন।

এই বলে সোনাব্যাং খরগোসের দিকে ফিরে ফুলতে আরম্ভ করল। এত ভীষণ ফুলে উঠল দেখতে দেখতে যে মঞ্চটাও মনে হল ছোট হয়ে গেছে। পেটটা বেলুনের মত ফুলে উঠল, পিঠটা কুলোর মত হয়ে উঠল, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। থর থর করে কাঁপতে লাগল তার মোটা পুরু ঠোঁট দুটো। খরগোস সে দিকে চেয়ে একটু একটু করে পিছু হটে আসতে লাগল। হঠাৎ বোমা ফাটার শব্দে ধমকে উঠল সোনাব্যাং—এখনও বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে? ভাঙব তোর হাঁড়ি এই হাটে? সাঁই করে লাঠিটা ঘুরিয়ে সে এমন ভঙ্গী করল যেন সত্যিকারের একটা হাঁড়ি সে তক্ষুনি ভেঙে ফেলবে।

ব্বা—বা—গো! একটা সরু আওয়াজ করে তড়াক করে লাফ দিল খরগোস। সভা ডিঙিয়ে—সকলের মাথার ওপর দিয়ে—ছিটকে পালিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। হা হা হা করে হাসতে লাগল উলট পালট খেয়ে সোনাব্যাং। চুপসে গেল তার ফোলান শরীরটা আগের মতই। সাধু!—সাধু!—ভীষণ হাততালি পড়ল চারিদিকে। কি চমৎকার—কি ম্যাজিকটাই দেখালো! এমন না হলে পেসিডেন্ট হওয়া চলে, এ্যাঁ! সেই কাঠঠোকরা এককোণে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে চোখ গুলি গুলি করে বললে কথাটা ময়নাকে। ময়না ঘাড় নেড়ে জবাব দিল,—ঠিক কথা! কাণখাড়া খরগোস একেবারে ৩ পেয়েদের মত ভীতু! ছ্যাঃ!

নয়

গুণে গুণে একশোটা ধিক্কার দিয়ে তবেই কাঠবিড়ালি স্বস্তি পেল। তারা তখন সভা ছেড়ে চলেছিল বনের পথ ধরে। পিছনে ভেসে আসছিল সভার হট্টগোল। ক্রমে তাও মিলিয়ে এল। আবার চাঁদের আলো-ধোওয়া নিস্তব্ধতা জেগে উঠল তাদের চারিপাশে। মস্ত বন-বিদেশের অজানা কথা গুণ গুণ করে উঠল তাদের ভাবনায়। চিন্তামণি তীরের ছোট জগতের ছোট্ট এক জীব কাঠবিড়ালি। সেখানে তারা নদীতীরে সারাদিন ছুটে ছুটে খেলা করে বেড়ায়। রাত্রি হলে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের আলোও খেলা করে চিন্তামণির জলে। বিকেলে সে আলোর রং হয়ে আসে গাঢ়, গভীর, অনেক আবির আকাশে ছড়িয়ে শেষে মুছে যায়। তার কথা মনে থাকে অন্ধকারেও। তারপর মাথার উপরে আকাশ ছেয়ে তারারা আসেন। তাঁরা আসেন আলোর ফুল ফুটিয়ে, থরে থরে। সব বাতি নিভে গেলে কেবল তাঁদের আলো জ্বলতে থাকে আকাশের কালো চোখে। তাঁরা অনেক দূরেরজন, সে দিকে চাইলে মনে হয় তাঁরা চেয়ে আছেন নিষ্পলক কাঠবিড়ালির মনের দিকে। কিন্তু তাঁদের ভাবনাগুলো এত গভীর যে কাঠবিড়ালির মত ছোট প্রাণীরা তা একটুও ভাবতে পারে না। তাই তারা ঘুমোয় যে সময়টাকে বলে নিশিরাত।

কিন্তু এই বনমুল্লুকের রীতিনীতি আলাদা। এখানে রাত্তিরে কেউ গান গায়। কেউ নাচে। মিটিং করে নয়ত ঝগড়া করে। অদ্ভুত! ভাবল কাঠবিড়ালি। ভাবতে ভাবতে সে তাকাল চারিপাশে। উঁচু উঁচু প্রকাণ্ড গাছগুলো বন-জ্যোৎস্নায় স্নান করছে দাঁড়িয়ে। কখনো পাতা একটা ঝরে পড়ছে টুপ করে। লুকিয়ে থেকে বনফুলেরা গন্ধ বিলোচ্ছে।

কোথায় তারা চলেছে? জিজ্ঞাসা করল সে কথাটা ইঁদুরকে।

—এই যেখানে হাঁটছি এর পিছনে হুতোম বক্সীর কোটর। ওপাশে টিয়া পাখী শিরোমণির ভিটে। ওই শশারাম কাকাতুয়ার দোলনা। ওই যে পিপুল গাছটা দেখতে পাচ্ছ যার দক্ষিণে তেপান্তর, এই আমাদের সীমানা। মিটিংয়ে যারা ছিল তাদেরও প্রত্যেকের সীমানা ওই পর্যন্ত। কিন্তু,—বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইঁদুর বলল,—এই সীমানার ওপারে সীমা-নেই-যার সেই মহাবন। ওখানে কেউ কোনদিন এগোয় না, কেউ কখনো ঘেঁষে না,—

হঠাৎ একটা অন্ধকার ঝোপের আড়াল থেকে কে একজন সাঁৎ করে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

চমকে উঠে ওরা চাইল। সে সেই শেয়াল। চাঁদের আলোয় মুচকি মুচকি হাসছে।

তোমাদের একটা মজার খবর বলতে এলুম!

কি খবর? জিজ্ঞাসা করল ইঁদুর।

মুখ্যু দুটো পালিয়েছে!

তাই নাকি? স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল দুজন।

হ্যাঁ। ইস্ কি পাগল ওরা! কিন্তু যেই না খাওয়ার কথা মনে প'ল অমনি দিল ছুট। তা তোমরা সেজেগুজে চলেছো কোথায়?

দেশ ভ্রমণে।

কেন?

থতমত খেয়ে রইল কাঠবিড়ালি। সে ভাবল স্বপ্ন বৃত্তান্তটা বলে। কিন্তু ইঁদুর জবাব দিল—

আমরা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি।

কি?

ওই পশ্চিম বনে যা আছে —

এ্যাঁ? কিন্তু ওদিকে কেউ যায় না যে—

যায় না বলেই ত যেতে চাই।

কেন যাবে? যেখানে কেউ যায় না সেখানে যেতে নেই—

কেন বলত? এবার পাল্টা প্রশ্ন করল ইঁদুর।

তাইত! থতমত খেয়ে ভাবতে লাগল শেয়াল। বুদ্ধিমান বলে সবাই তাকে মানে। কিন্তু এ কথাটা ত সে কোনদিন ভেবে দেখে নি। তবু বলল,—নিশ্চয়ই কোনো মানা আছে।

সেইটেই ত জানা চাই! নয় কি?—তাকিয়ে বলল ইঁদুর।

শেয়াল পশ্চিম বনের সেই ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। তারও ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে যা জানা নেই তা খুঁজে বেড়াতে। কিন্তু সে যে ভয়ানক বিপদের। তার চেয়ে সবাই তাকে জানে শেয়াল পণ্ডিত বলে, তার বুদ্ধির খ্যাতি সমস্ত পশু রাজ্যে। কি দরকার তার বেশী জানা? সে যে পশ্চিম বনটার কিছুই জানে না তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ এ মুল্লুকের যত পশু প্রাণী সকলেই মেনে নিয়েছে যে ওদিকে যাওয়া বারণ। তাই তার ফাঁকিটা কোন দিনই ধরা পড়বেনা। কথাটা মনে হতেই ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শেয়াল।

যাচ্ছ যাও!—তারপর ইঁদুরের কানে কানে বলল,—ফিরে এসে কাকেও বোলোনা যেন? কেবল আমাকে বোলো।—

কাঠবিড়ালি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কোন কথাটা,—হঠাৎ বোঁ করে শেয়াল পাশের এক সড়ক দিয়ে ছুট দিল।

ওই পিপুল গাছ!—হাত তুলে দেখাল ইঁদুর। অনেক দূরে তারা দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড গাছ। সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। চাঁদের আলোর এক প্রকাণ্ড চাদর ঢাকা তার গায়। চারিদিকের অগুনতি গাছের মাঝখানে তাকে দেখাচ্ছিল অনেক বয়সী এক বুড়ো দাদুর মত।

তারা এগিয়ে চলল সে দিকে। রাতের বেলা অসংখ্য জন্তুদের চলা ফেরার শব্দ কথাবার্তা খোশগল্প হঠাৎ কমে এল। প্রকাণ্ড পিপুল গাছ একরাশ নিঃশব্দ ছায়াকে জড়িয়ে ধরে কেবলই বড় হয়ে উঠতে লাগল চোখের উপর।

কাঠবিড়ালি ফিসফিস করে বলল—এই ছায়ার ওধারে কে থাকেন?

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর। হালুম হালুম!

শুনে কাঠবিড়ালি কি বুঝলো বলা যায় না। ভয়ে ভয়ে তারা দুজন হাত ধরাধরি করে সেই মস্ত গাছের ছায়া-দাগের মধ্যে পা বাড়ালো। চারিপাশের ছোট খাটো গাছ তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল ক্ষুদ্র দুজন দেশ ভ্রমণকারীকে।

ইঁদুর বলল, ওপারে কারও যেতে মানা ; কারণ ওখানে আছে বিষম ভয়। কিন্তু আমরা ভয় করবনা। তুমি আর আমি হলেম বীরপুরুষ। তাই আমরা অজানাকে জানতে বেরিয়েছি।

ছায়ায় ঘুটঘুটে গাছটার নীচে এসে দাঁড়াতেই এতক্ষণ যে ধপধপে চাঁদের আলো তাদের পথ দেখিয়ে চলেছিল তা কালো রঙের বুরুশ দিয়ে কে যেন মুছে দিল। উপরে একটা আঁধারের মস্ত কালো হাঁড়ি উপুড় করা। তা থেকে ফোটা ফোটা অদৃশ্য কালি ঝরে তাদের সর্বাঙ্গ একাকার করে ফেলতে লাগল। নিঃশ্বাসের সঙ্গেও সেই কালি নাক দিয়ে ঢুকে ছড়িয়ে গেল বুকে হৃৎপিণ্ডে আর মনের ভিতর।

কিন্তু ওগুলো কি ? অন্ধকার ঘেরাটোপের মধ্যে জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে জোড়া জোড়া সব্জে আগুনের ফোঁটা। জ্বলছে আর নিভে যাচ্ছে—আবার জ্বলে উঠছে। কাঠবিড়ালির বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। ইঁদুরের হাতটা খামচে টেনে বলল—

ও—ও—সব কি!!

তক্ষক সাপ! বললে ইঁদুর,—গাছেই থাকে। ওরা খারাপ লোক নয়।

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই একটা সরসর আওয়াজ শোনা গেল। সেই জোড়া জোড়া সব্জে চোখগুলো সরে সরে এসে জমা হতে লাগল এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে। সাঁই সাঁই করে শিষ দিয়ে কারা ডাকাডাকি করতে লাগল এদিক ওদিক থেকে। কাদের বুট জুতোর ঠোকাঠুকির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

কাঠবিড়ালি চাপা গলায় বলে উঠল,—দেখছ, একটা "ও"র মত হয়ে উঠছে চোখগুলো।

ইঁদুরও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—আর একটা হ্রস্ব-"ই" —

চাইতে চাইতেই চোখের উপর একের পরে আর এক অক্ষর ফুটে উঠতে

লাগল। শেষে চোখগুলো একটা মস্ত দাঁড়ির মত হয়ে থেমে রইল। তারা পড়ল অন্ধকার হাঁড়িটার মধ্যে লেখা

ও দি কে যে ও না ক !

হুঁ হুঁ? যেতে মানা করছে? কেন?—ইঁদুর ওপরের দিকে মুখ তুলে তক্ষকদের জিজ্ঞাসা করল চেঁচিয়ে—কেন?

চোখগুলো অমনি সারি ভেঙ্গে ছিটিয়ে পড়ল। তারপর আবার সাজাতে লাগল আগের মত। এবার তারা পড়ল

ভ য় !

ইঁদুর একটু চুপ করে থেকে মুখের সামনে তার হাতের তালু গোল করে ধরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কিসের?

চোখগুলো কোনো জবাব দিল না। কেবল স্থির লেখা হয়ে রইল—**ভয়!**

কাঠবিড়ালির হাতটা তুলে নিয়ে ইঁদুর বলল,—চল এগোই। আবার তারা এগিয়ে চলল। যেতে যেতে একবার উপরে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল,—আমরা একটুও ভয় করিনে। আমরা হলেম বিষম বীর!

কিন্তু ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল ওদের থেকে থেকে। অজানা অনেক কিছু যা ভাবা যায় না সেই মস্ত হাঁড়ির মধ্যে থেকে মুখ ভ্যাঙাচ্ছিল। থেকে থেকে বিদঘুটে কথা যত মনের মধ্যে থাবা উঁচিয়ে শাসাচ্ছিল। সেই সাজানো চোখগুলো জ্বল-জ্বল করে চেয়ে থাকল তাদের পিছনে মাত্র একটা কথায়—**ভয়!**

সামনে তাদের কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ-ধোওয়া দাগটা ফুটে উঠতে লাগল। সেটা সেই বনস্পতির ছায়া-সীমা। ওপারে চাঁদের রাজ্য। কিন্তু গাঢ় আঁধারে মনে হচ্ছিল এত দূরে যেন একটা বাঁকা আলোর নদী বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

তারা ছায়া থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে পাহাড়ের মত সেই বিরাট মহীতরু। আর সামনে এক প্রকাণ্ড বন। প্রকাণ্ড তার গাছগুলো সারি সারি উঠেছে। তাদের মোটা মোটা গুঁড়ি পুরাকালের দৈত্য-প্রাসাদের থামের মত সারিবদ্ধ। তাদের পাতা বড় বড় বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে। গুঁড়ির রং বিচিত্র, কোনটা সাদা, কোনটা কালো, কোনটা ইস্পাতের মত ঝকঝক করছে চাঁদের আলোয়। তাদের জড়িয়ে লতা অজগর সাপের মত পাক খেয়ে উঠেছে। সব স্থির হয়ে আছে কোন মন্ত্রপড়া ঘুমন্ত দেশের মত। মাটিতে শুকনো আর আধ্ শুকনো পাতা বিছিয়ে। কোনটা এত বড় যে তলা দিয়ে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি হেঁটে যেতে লাগল মাথা উঁচু করে। আর নানা পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে। কিন্তু এই সড়কগুলো ভীষণ চওড়া।

কোন পথ তারা নেবে? অনেক পথের দাগের মধ্যে একটা দেখে মনে হল সেটা অনেকেরই যাওয়া আসার পথ। সম্ভবত এইটেই রাজধানীর সড়ক? কারণ তার দাগ রোদে বৃষ্টিতে ধুয়ে পোক্ত হয়ে আছে। ইঁদুর এক চিমটে মাটি তুলে শুঁকে পরীক্ষা করল। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে রাজধানীর এটাই রাজপথ।

পাশাপাশি তারা হেঁটে চলল সেই অজানা বনে। দুধারে গাছের ডাল বড় বড় হাত বাড়িয়ে ধরে তাদের মাথার উপর। আর বড় বড় পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরনার মত নামছে। বড় বড় ছায়া স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। কাছ দিয়ে চলে গেলেও যেন টের পাচ্ছে না। কেবল পায়ের কাছে ছোট ছোট আলো-ছায়ার কুচোগুলো ছুটে আসছে। কাছে এসেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে পড়ছে। দেখছে তাদের ভ্রমণের পা দুজোড়া। পূবের বনভূমিতে যে সব ডাকাডাকি কথাবার্তা শুনেছিল এখানে তার একটিও শোনা যায় না। ওরাও কথা বলছিল না। যেন সেই জমাট নিঃসাড় প্রকাণ্ড অরণ্য চমকে উঠবে ভয়ানক, একটি ফিস্‌ফিস্ শব্দেও। এমনি চলেছে কতক্ষণ তার ঠিকানা নেই। তখন রাতের দ্বিতীয় প্রহরের খবর দিয়ে গেল অস্পষ্ট এক পলক হাওয়া।

হঠাৎ কাঠবিড়ালি ইঁদুরের হাত ধরে এক হেঁচকা টান দিল। তারা

মোটেই লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ যে রাজপথ ধরে তারা চলেছে তার উপর কতক-গুলো গুমো গুমো পায়ের দাগ কেবলই ফুটে উঠছিল।

ইঁদুর ভাই, ওগুলো কি? আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি।

সে দিকে তাকিয়ে পাথরের মত জমে গেল ইঁদুর। পরিষ্কার পথটায় কয়েকটা প্রকাণ্ড গর্ত ফুটে উঠে সামনে থেমে গেছে। তারপর কিছু নেই……

পায়ের দাগ? স্পষ্টই তা মনে হচ্ছে। সন্থ কারও চলে যাওয়ায় ফলেই ফুটে উঠেছে। ওরা কি-করি-না-করি মনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে যেখানে শেষ দাগটা ফুটে রয়েছিল এসে দাঁড়াল।

ইস্! যে মহাজনের পায়ের দাগ এতখানি তাঁর চেহারা কেমনতর? ইঁদুর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা মাপবার টেপ বার করে কাঠবিড়ালিকে ইসারা করল ধরতে। হঠাৎ একটা ভয় তাদের মনের পাঁচিলের ডগায় মুখ তুলে তাকাল,—পায়ের দাগ শেষ হল কি করে? তবে কি সেই ব্যক্তি এখানেই কোথাও…?

মনে হতে না হতেই গাছপালা শিউরে একটা ভীষণ গলা কামান গর্জে উঠল,

—কি দেখছ!!

যেন একশ'টা ঢাকে একবার করে কাঠি পড়ল। চমকে ওরা তাকাল যে দিকে আওয়াজটা এসেছিল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। একটা প্রকাণ্ড ঝোপ, থম থম করছে আলোয়।

সর্ সর্ করে ইঁদুরের হাতের ইঞ্চিকাটা ফিতের বাণ্ডিলটা পাক খুলে পড়ে গেল। তারা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সাড়ে ৩২ ইঞ্চির দাগের ওপর চাঁদের আলো স্থির হয়ে জমে রয়েছে।

কি দেখছ বোকারামের মত?—আবার সেই স্বর ধমকে জিজ্ঞাসা করল কোত্থেকে।

ইঁদুর এবার কাঁপা গলায় উত্তর দিল,—আজ্ঞে আপনার পায়ের দাগ!

পায়ের দাগ?—কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল আড়াল থেকে আবার।

আজ্ঞে হ্যাঁ!



মিথ্যে কথা !

কাঠবিড়ালির এতক্ষণে একটু সাহস ফিরে এসোছল। সে তার সবচেয়ে মার্জিত গলায় সেই অদৃশ্য কথোপকথনকারীকে উদ্দেশ্য করে বলল, —আজ্ঞে সত্যি বলছি, আপনার পায়ের দাগ বই এখানে আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না !

অম্অম্অম্ ! তা রসি বের করেছ কেন ?

আজ্ঞে রসি নয়। ওটা টেপ্ !

অ ! একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়তে শোনা গেল ঝোপের ভিতরে। কাঠবিড়ালি আরও সাহস করে বলল,—

অনুগ্রহ করে বলবেন কি কার সাথে আমাদের আলাপের সৌভাগ্য—

আমি গণ্ডার !! খুব বড়ো গলায় জবাব এল। সঙ্গে সঙ্গে মড়মড়িয়ে ঝোপ ভেঙে বেরিয়ে এল পাহাড়ের মত একজন ভীষণ প্রাণী। তার সারা গায়ে মস্ত পুরু ইস্পাতের পাত রিবিট করে ঠোকা। কাঁধ নেই, সেখানে একখান ইঁদারার চরকী বসানো। মুখটা উদুখলের মত, কান লাঙলের হাতা, আর ভয়ংকর একটা বাঁকা ঝকঝকে তলোয়ার নাকের ওপর পুঁতে রাখা হয়েছে। একটা সত্যিকারের আষাঢ়ের মেঘের মত সেই বিষম মূর্তি গুমো গুমো পা ফেলে দুপ্ করে দাঁড়াল সামনে।

বেচারা কাঠবিড়ালি আর ইঁদুর ! এমন মহাজনের মূর্তি যে কল্পনারও অতীত ! ভয়ে দুজনের ল্যাজ মাটিতে মিশিয়ে রইল।

আমার চেহারা দেখেছ ? বললে গণ্ডার।

এতক্ষণে ওরা টের পেল নাকের ওপর সেই খাঁড়াটার দু পাশ থেকে দুটো কুতকুতে চোখ একমনে ওদের দেখছে।

আজ্ঞে হাঁ! অসোয়াস্তির সঙ্গে জবাব দিল ইঁদুর।

তোমাদের হারিয়ে দিতে পারি!

আজ্ঞে হাঁ!

তোমাদের দুজনাকেই একসঙ্গে হারিয়ে দিতে পারি—!

আজ্ঞে অবশ্যই তা পারেন!—ব্যাপারটা এবারে পুরোপুরি বুঝে জবাব দিল ইঁদুর। গণ্ডার বেশ খুশি হয়ে দুবার ল্যাজটাকে চরকির মত ঘোরালো। কিন্তু আবার তার চোখ দুটো হঠাৎ ছোট হয়ে এল। একটা ক্রুর চাউনী ফুটে উঠল। বলল ভীষণ সন্দেহের গলায়—

—মিথ্যে কথা বলছ না ত?

কাঠবিড়ালির ভীষণ হাসি পেল। সত্যি বলতে কি বনভ্রমণে বেরিয়ে অবধি তার মনে হয়েছে এদিকের প্রত্যেক অধিবাসীরই অল্প বিস্তর মাথা খারাপ। কেবল ইঁদুর ছাড়া। কোনমতে হাসি চেপে বলল,

—আজ্ঞে না, আপনার মত প্রকাণ্ড বীরের সঙ্গে কি কেউ পেরে ওঠে! চাইলেই ভয় পালিয়ে যাবে!

শুনে মনে মনে খুব প্রসন্ন হল গণ্ডার। কিন্তু ওপরে ভাবটা চাপা দিয়ে বলল,

—না, বিশ্বাস না হলে কুস্তি লড়।

না! না! না! একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে,—আমরা বিদেশী মশাই! দেশভ্রমণ করতে এসেছি এই বনে, আমাদের কুস্তি লড়বার আদৌ ইচ্ছে নেই।

গণ্ডার ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল,—তা তোমাদের যদি একান্তই ইচ্ছে না থাকে তা হলে অবিশ্যি পেড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনে রেখো, আমার চেয়ে গায়ের জোর কা—রো নেই, এমন কি,—বলে মুখটা তাদের কানের কাছে খুব নামিয়ে এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—এমন কি রাজাবাহাদুরেরও নেই! বলেই থুত্‌নী উঁচিয়ে একটা না-করি-কেয়ার-তোমার-যা-খুশী-তা-কর ভঙ্গীতে আড়চোখে দেখতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে।

রাজাবাহাদুরের গায় বুঝি বিষম জোর? কথাটা সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি।

ছাই জোর! বলল গণ্ডার।—কেবল গলার জোরে রাজত্বি করে! তারপর বারকোষের মত মুখখানা ওদের দুজনের মাঝখানে নামিয়ে এনে ফিস্-ফিস্ করে বলল,—কিন্তু গলার জোরে বেশিদিন রাজত্ব করা যায় না! বুঝলে? চাই হিম্মৎ! তাই আমি বলে রাখছি,—বলে ভয় ভয় এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল,—একদিন রাজাবাহাদুরের ল্যাজ এমন মুচড়ে দোব যে সেদিন বিদ্যে বেরিয়ে যাবে! হ্যাঁ, গণ্ডারকে চেনা সোজা কথা নয়!—ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সামনের শুঁড়ি পথটায় সে পায়চারী করতে শুরু করল। হয়ত অনন্তকাল ধরেই গণ্ডার রাজাবাহাদুরের ল্যাজ না মোচড়াতে পারার ক্ষোভে এই ভাবে পাইচারী করত। কিন্তু ইঁদুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—তখন কি হবে?

খটাস্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গণ্ডার বলল,—তখন? তখন আমি রাজা হব আর তোমাকে সেনাপতি করব! আর তোমাকে,—বলে কাঠবিড়ালির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,—আমার উজির-ই-আজম করব।

এমন এক কথায় সেনাপতি আর উজির-ই-আজম হওয়া চাড্ডিখানি কথা নয়! পশ্চিম বনে ঢুকতে না ঢুকতেই এত বড় বড় পদ তারা পেয়ে বসবে তাই বা কে জানত? তবু ইঁদুরের মনে একটু সন্দেহ হল। বলল,—

হ্যাঁ হলে পর। কিন্তু রাজাবাহাদুর যদি বেঁকে বসেন?

পরোয়া নেই! বর্মগুলো ঝাঁকি দিয়ে বলল গণ্ডার।

যদি রেগে গিয়ে কামড়ে দেন?

পারবেন না! ভীষণ শক্ত আমার গায়ের চামড়া। বিশ্বাস না হয় চিমটি কেটে দেখ।

ভয় ভয় ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি তাদের ধারালো নখ দিয়ে গণ্ডার মশাইয়ের পায়ে একটু চিমটি কেটে পরখ করল।

ইস্, লোহার মত শক্ত। ইঁদুরের কিন্তু তবু সন্দেহ ঘুচলো না। বলল,—কিন্তু ভীষণ রেগে যদি হালুম করে ওঠেন?

গণ্ডার সাংঘাতিক চমকে উঠল। দেখতে দেখতে সারামুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে বেজে উঠল ইস্পাতের বর্মগুলো। তোৎলাতে তোৎলাতে বলে উঠল—ত্-তা হলে আমি দৌড়ে পালিয়ে যাব!

কি সর্বনাশ! রাজাবাহাদুরের এক ডাকে যে পালিয়ে যাবে সে রাজত্ব করবে? আর তক্ষুনি অনেক দূর থেকে বন কাঁপিয়ে একটা মেঘের মত বজ্রস্বর গড়িয়ে এল—হালুম!!

চমকে উঠল বনের গাছপালা সব। একটা প্রকাণ্ড কালো মেঘ গুঁড়ি মেরে এসে ধপধপে চাঁদকে তার আলখাল্লায় মুড়ে ফেলল। লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে একটা ছোট্ট হাওয়া ফিস্‌ফিসিয়ে বলে গেল, সাবধান! সাবধান! রাজাবাহাদুর বিষম রাগ করেছেন!

সেই সঙ্গে ভেসে এল—যেন অনেক দূর থেকে—কোনো বিরাট জানোয়ারের পায়ের শব্দ—ধুপ ধুপ! ধুপ ধুপ! বেগে এগিয়ে আসছে। যেন একশোটা মাল গাড়ির ইঞ্জিনে পিস্টন তালে তালে ঘা দিচ্ছে। বন রসাতল করে ডালপালা মড়মড়িয়ে ভেঙে সোজা ছুটে আসতে লাগল আওয়াজটা শুঁড়ি পথ ধরে।

কাঠবিড়ালির হাতে হেঁচকা টান মেরে ইঁদুর সরে এল রাস্তা থেকে। —শীগগির সরে দাঁড়াও। ভয় পেওনা একটুও।

কাঠবিড়ালির মুখ ভয়ে পাংশুটে হয়ে গিয়েছিল। তবু প্রাণপণে সাহসের সঙ্গে বলল,—একটুও না। আমি মোট্টেই ভয় পাইনি! কিন্তু ভয় পেয়েছিল অপর জন। এমনই বিষম ভয় সে পেয়েছিল যে ওদের রাস্তা থেকে সরে যেতে দেখে চীৎকার করে বলল,

এ্যাঁ! আমাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে! এদিকে রাজাবাহাদুর রেগে কাঁই হয়ে হুম হুম করে ছুটে আসছেন আর—এ্যাঁ—তোমরা লুকোচ্ছো কোথা? বাঃ! আমি বুঝি একলাটি পড়ে থাকব, আর রাজাবাহাদুর এসে গাঁক করে অমনি আমার কান চেপে ধরুন! বাঃ—তা হবে না কিন্তু! আম্মো তা হ'লে তোমাদের পেছন পেছন লুকোব! বলে গণ্ডার হন্তদন্ত হয়ে ওদের পিছনে এসে দাঁড়াল।

ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি বিপদের সংকেত পেয়ে সত্যিই একটা লুকোবার জায়গা খুঁজছিল। তারা দেখতে পেল হাত চারেক তফাতে ঘন বনকলমী আর সেঁয়াকুলের ঘোরালো কাঁটাঝোপের মাঝখানে একটা উঁই-ঢিপির মতো কি দেখা যাচ্ছে। ঢিপিটা উপরে এক বিঘৎ জেগে। দেখতে পেয়েই তারা ছুটে গিয়ে সেটায় চড়ে পড়ল। উপরটা ক্ষয়ে গিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখ দেখা যাচ্ছিল। নেমে গেছে মাটির ভিতরে, অনেক নীচে উঁইয়েদের বস্তি দেখা যাচ্ছিল। ওরা গর্তের মধ্যে নেমে গলা বাড়িয়ে চেয়ে রইল শুঁড়ি পথটার দিকে।

আলো মুছে গেছে আকাশ থেকে। আর সেই ভারী ধুপ ধুপ আওয়াজ বনের বুকে আরও জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করে বেজে উঠতে লাগল।

গণ্ডার ওদের ঝোপের মধ্যে ঢুকতে দেখে দৌড়ে এসেছিল পিছনে। কিন্তু ওর চোখ দুটো এত ছোট যে উঁইঢিপির ওপরে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালির মুখ দুটা দেখতেই পেল না।

কই ছাই! কোথায় আবার সরে পড়লে তোমরা? ছটফট করে বলল সে,—বাঃ, তোমাদের তো স্বয়ং ব্রহ্মাও পাঁচজোড়া চোখে খুঁজে পাবেন না! আর ইদিকে আমায় সব্বাই দেখতে পাচ্ছে একটা আস্ত পাহাড়ের মত! ছিঃ স্বার্থপর হও না—বল কোথায় লুকিয়েচো!

ইঁদুর কাঠবিড়ালির দিকে ফিরে বলল, দেখেছ? গণ্ডার মশাই কি বীর? গলাটা একটু বাড়িয়ে বলল,--এই যে, এই খেনে দাঁড়িয়ে আমরা।

এবার দেখতে পেল ওদের গণ্ডার। অমনি হাঁচোর পাঁচোর করে ঝোপের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করল। কিন্তু তা ও কি সম্ভব? ঝোপে ঢাকা পড়ল মাত্র তার খাঁড়াটা। বারকোষের মত প্রকাণ্ড মুখ আর কুৎকুতে অসভ্য চোখ দুটো। কিন্তু গণ্ডারের মনে হল আর কেউ দেখতে পাচ্ছেনা তাকে। কেমন বেজায় বেজায় অন্ধকার। ফিক্ করে একটু হেসে বলল,—কি বোকা বনবে রাজা-বাহাদুর আমাদের কাক্কেও না খুঁজে পেয়ে! হিহি!

মেঘ ঢাকা জ্যোৎস্নায় গণ্ডারের পিঠটা দেখাতে লাগল নদীর বুকে নৌকার ছইয়ের মতো। আর উঁচু উঁচু অন্ধকার গাছগুলোর ছায়া স্রোতের মত বইছে।

তখন তিনজনা কান পেতে শুনতে লাগল দূরে ধুপ ধুপ করে এগিয়ে আসা শব্দটা। সেই তালে গণ্ডার ইঁদুর আর কাঠবিড়ালিদের হৃৎপিণ্ডগুলোও দুমদাম করে বেজে চলল। ধুপ-ধুপ! ধুপ-ধুপ! ওই বাঁকের মুখে…

উঁইঢিপি-পাহাড়ের চূড়ো থেকে মশালের মত চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল ওরা। হঠাৎ ইঁদুর কাঠবিড়ালির হাত চেপে ধরে বলল, ওই দেখ!

যেন এক প্রকাণ্ড মেঘের ছায়া গড়িয়ে এসে ঢিপির পাশে নীরেট হয়ে থেমে গেল। আলো-লোপাট অন্ধকার আরো ঘোর হয়ে উঠল। তারপর ছায়া-ছায়া গলায় বলল সেই অতিকায় ছায়া—

হি! পায়ের দাগকটা ফুরিয়ে গেল মনে হচ্চে? হুঁ? কে হে? কারা হে? জবাব দাও!

কেউ জবাব দিল না। একটু থেমে থেকে হঠাৎ বোঁ বোঁ করে ঝোপের চারপাশে পাক খেতে লাগল ছায়াটা। আর রক্ষে নেই!—ইঁদুর ইসারা করে দেখাল গণ্ডারের দিকে। সে চোখ দুটো গুবরে পোকার মত গুটিয়ে বিড় বিড় করে আওড়াচ্ছে… দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! ঠিক তক্ষুনি গাঁক করে হাঁক ছেড়ে ছায়াটা দৌড়ে এল ঝোপের দিকে।

সোহনাল্লাহ্‌! পেয়েছি! এই লুকোলাম! এই মোট্টা মোট্টা গুঁড়িটার পাশে কেউ আর দেখতে পাবে না। ওহে রাজাবাহাদুর! কেমন কলা দেখালাম! এখন খুঁজে বার করত দেখি!—সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রকাণ্ড শিং আর হাপরের মত মাথা ঠেলেঠুলে ঝোপটায় ঢুকে চোখ বুঁজে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল।

সর্বনাশ! ইনি ত রাজাবাহাদুর নন্‌! তবে কে? কিন্তু ভাববার সময় না দিয়েই শোনা গেল আবার এক প্রলয়ঙ্কর পদধ্বনি। যেন দারুণ বলবন্ত কেউ পা দিয়ে মেদিনীকে পাঁউরুটি বানাতে বানাতে এগিয়ে আসছে। এ কোন পরাক্রান্ত বিক্রম বীরের শুভ আগমন? ভাবতে লাগল দুরু দুরু বক্ষে ঝোপের মধ্যে চোখ বুঁজেছিল যারা। সত্যিই আর রক্ষে নেই!

দুপদাপিয়ে শুঁড়িপথ থেঁতো করে আওয়াজ এসে থেমে দাঁড়াল ঠিক আগের জায়গায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

ও ব্বাবা! এখানেও যে দেখি পায়ের দাগে ভর্তি! কে এরা? কে তোমরা? শত্রু না মিত্র? ঝপ্ করে বল! তার পরেই,—জয়গুরু! হু হুটো মোটা গুঁড়ি! এই আম্মো লুকোলাম! ওহে রাজাবাহাদুর! ওহে গোঁফ-সর্বস্ব শসারাম সারখেল! আমি লুকোলাম!!

ঠেলে ঠুলে ঢুকে পড়ল একটা হাঁড়ি-মুখো রোমশ বিদঘুটে মুখ। সে দিকে তাকিয়েই কাঠবিড়ালি পিছন ফিরে দাঁড়াল। সে মুখের দিকে তাকান যায় না।

আবার থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মাটি। উঁইঢিপির চূড়োটা পাগলের মত দুলতে শুরু করল। যেন একটা প্রবল ভূমিকম্প মাটির বুক খান খান করে ফেলছে। তিনটে প্রকাণ্ড গুঁড়ির মত মোটা শরীর গড়াগড়ি করে ঠোকাঠুকি লাগতে লাগল এ ওর গায়।

শুঁড়ি রাস্তা বেয়ে ছুটে আসছিল আরও একজন। কিছু দেখা যাচ্ছেনা। মেঘের ডাকের মত গুর্ গুর্ আওয়াজে ভরে উঠল চারিদিক। একটা দমকা হাওয়ার ঝড় ধুলো উড়িয়ে ঢেকে ফেলল দিকবিদিক। আর সেই দারুণ দুর্দৈবের মধ্যে সবার মনের পর্দায় ছায়াছবির মত ফুটে উঠল মহারাজাধিরাজের হাঁড়িপানা মুখটা।

একটা আকাশ ছোঁওয়া ছায়া ছড়িয়ে পড়ল ঝোপ ঢেকে। তারপর সেই ছায়ার গম্বুজ থেকে একটা গভীর স্বর গড়িয়ে এল,

—হা কপাল! শত যোজন ছুটে এলুম রাজাসায়েবের হালুম শুনে। তবু নিষ্কৃতি নেই? এখানেও পায়ের দাগ? আমাকে ধরবার ফন্দী? একা আমিই আসামী? ওহে কে তোমরা? সেপাই? শান্ত্রী? জল্লাদ? জবাব দাও!—

মাটি তোলপাড় করে প্রকাণ্ড ছায়া খোঁজাখুঁজি করতে লাগল চারিপাশে। আর তখনই দূর থেকে,—অনেক দূর থেকে, ভেসে এল একটা পা ফেলে এগিয়ে আসার শব্দ। ধীরে, একের পর এক, গুণে গুণে। যেন বেজায় খোশ্ মেজাজে আসছে কেউ এই ভেবে যে কোনো ভাবনাই নেই!

পাগলের মত আকাশী-ছায়া ছুটে এল উঁইঢিপির দিকে। পরমুহূর্তে

ঝোপটার অন্যদিক চড় চড় করে উপড়ে ফেলে সেঁধোলো সিংদরজার মত একটা মাথা। দশ হাত লম্বা শুঁড় আর তিব্বতী শিঙার মত আশী হাত দীর্ঘ গজ দন্ত। ব্যস!

জয় তারা! ব্রহ্মময়ী মা! ঝোপের মধ্যেই শুঁড় কপালে ঠেকিয়ে সে প্রণাম করল কাকে।

ছোট্ট ঝোপটা এবার সত্যিই ঘনাল হয়ে উঠল। কারণ চার চারটে মহা পরাক্রান্ত মুণ্ড চারদিকে চারটে গম্বুজের মত জেগে উঠেছিল।

—ইঁদুর ভাই! আর এখানে একটুও জায়গা নেই। চল আমরা বেরিয়ে যাই! বলল কাঠবিড়ালি। তারা পা টিপে টিপে উঁইঢিপির গা বেয়ে নেমে এল। তারপর মাথাগুলোর ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে এল আবার রাস্তায়। মাথাগুলো জানতেও পারল না। কারণ ওরা তখন বিভিন্ন ভাষায় ইষ্টনাম জপছিল।

একটা নাহুস দেখে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠে ডালে পা ঝুলিয়ে বসল ওরা। আর চেয়ে রইল সামনের দিকে।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। খট্ খট্—খট্ খট্! শাঁই শাঁই করে হাওয়া বইছিল। বনঝাউয়ের কাঠিগুলো নাচানাচি করছিল। বড় বড় গাছের ডালপালার বিনুনী রহস্যে জড়াজড়ি করে রইল।

রাজাবাহাদুর নাকি? জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি। দূরে অস্পষ্ট ছায়ায় দেখা গেল একজনকে। কিন্তু বোঝা গেল না ঘনাল অন্ধকারে।

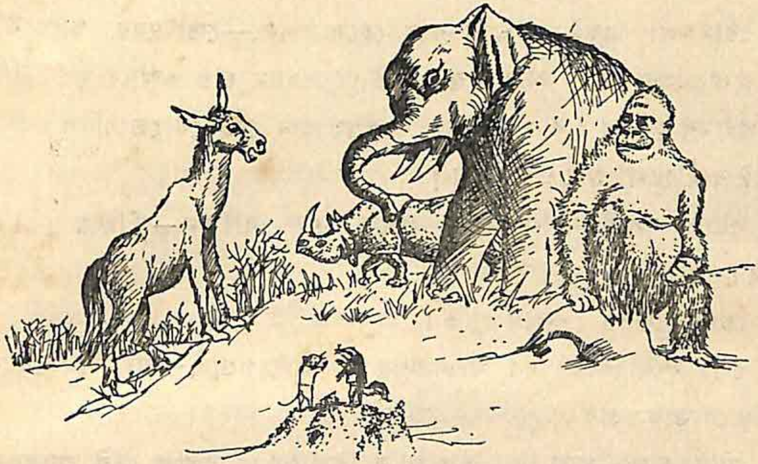
ইনি? ইঁদুর ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—কিন্তু কেমন সন্দ লাগছে।

অতো বড় কান? অবাক হয়ে তাকাল কাঠবিড়ালি।

—আর সারা গায় ছেয়ে ছেয়ে রোঁয়া ভর্তি। কোথায় সেই মখমলের ডোরাকাটা আলখাল্লা?

—পায়ে নাগরা নেইত—কেবল বুট জুতো! খট্ খট্ শব্দ গাছের তলায় এসে পোঁছল। এবারে স্পষ্ট দেখা গেল,—গোঁফ নেই একগাছাও! আর সেই ভাঁটার মত চাউনী যা বইতে লেখা ছিল, . . . ভাবল কাঠবিড়ালি।

চমকে থেমে দাঁড়াল আগন্তুক। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে



রইল চারটে প্রকাণ্ড ধড় যেখানে কাৎ হয়ে পড়ে মাটি শুঁকছিল। অল্প অল্প করে তাঁর ঠোঁটের কোণ ছটো কুঁচকে উপরে উঠল। তারপর সমস্ত শরীরটা দমকা হাওয়া লাগা কলাপাতার মত কেঁপে উঠল—

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

শিউরে উঠল বনের গাছগুলো সেই বিদঘুটে হাসির আওয়াজে। চৌকো চৌকো ছ সার দাঁত বের করে দারুণ অবজ্ঞায় হাসতে লাগল সে।

হা! হা! হা! হা! এমনটি কেউ কখনো দেখেছে? একটা ধেড়ে হাতি, একটা গণ্ডার, বুনোমোষ, আর অরণ্য কিম্ভূত—চার চারটে পাজি ঝোপে মুখ লুকিয়ে মিলে-মিশে শলা করছে মহারাজের সর্বনাশ করার? এ্যাঁ? বে-ই-মান্!!

কথা শেষ হতে না হতেই মড় মড় করে উঠল ঝোপটা। চারজন ভীম পরাক্রান্ত যণ্ডা পশু এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল ঝোপ শুদ্ধ উপড়ে মাথায় করে।

—কে মিথ্যে করে বলছে আমাদের নামে? গর্জে উঠল গণ্ডার,—বেটা মহারাজের আদৎ শত্রু! বলে সমর্থনের জন্য তাকাল হাতির দিকে।

শুঁড়টা মুষলের মত বাগিয়ে ধরে হাতি বলল,—মিথ্যে দোষারোপ নৈব নৈব চ! তোমাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেফ্‌তার করব!

রোমঅলা বিকট হো-হো করে হেসে বলল,—তোমাদের হাতে-নাতে এবার ধরে ফেলেছি! আর নিস্তার নেই! ওখানে চার ওস্তাদে মুখ ঢুকিয়ে কি পরামর্শ হচ্ছিল বাবা? আমার কি লম্বা কান নেই যে ভেবেচিস্ তোদের নিকৃষ্ট ফন্দীগুলো শুনতে পাই নি?

ব্যাটা স্পাই!—শিং নেড়ে তেড়ে এল বাইসন—ঢুঁসিয়ে কাহিল করব তোকে!

চেপটে দোব! বললে হাতি।

পেট ফুটো করে দেব খাঁড়া দিয়ে! বলল গণ্ডার,—দালালি করে বড় ভুঁড়ি বেড়েছে তোর!

গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে তক্তপোষে বিছোবো! বললে সেই আরেকজন যে ভয়ানক কুচ্ছিত দেখতে।

খবরদার! তালঠুকে বলল গাধা। কিন্তু রীতিমত ভয় পেয়েছিল সে। তবু সে ভাব একটুও প্রকাশ করল না। চারপাশে দাঁড়ানো ভীষণ ষণ্ডা জন্তুগুলোর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল,—খবরদার! আমি রাজার বিদূষক সে কথা জানিস? কাছে এলেই চাঁট মারব!

তারপর সে একটু চিন্তা করতে লাগল। হঠাৎ ঘাড় তুলে আচমকা প্রশ্ন করল,

তোমরা এখানে কি করছিলে?

অম্অম্অম্! থতমত খেয়ে তাকাল আর সকলে। পরক্ষণেই খাঁড়া দুলিয়ে বলল গণ্ডার,—আমরা মহারাজের শত্রুদের ষড়যন্ত্র আড়ি পেতে শুনছিলুম!

মহারাজের শত্রু?

হ্যাঁ—!! চারটে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সায় দিল।

ব্-ব—লো কি?

এক্কেবারে খাঁটি সন্দেশ!

কি বললে তারা?

চারজনে ছুটে এসে গাধার কানে কানে বলল,—তারা নাকি মহারাজের ল্যাজ মুচড়ে দেবে!!

এ্যাঁ! চোখ পিরীচের মত খুলে চাইল রোঁয়াঅলা।

চারজন হোঁৎকা প্রাণী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল। চারিদিকে গাছের ছায়া জড়িয়ে গেল জটার মত। বাতাস কুণ্ডলী পাকিয়ে বাদুড়ের মত ঝুলে রইল আকাশের ঝুলকালি ছাদ থেকে।

কোথায় সেই অসজ্জন প্রাণীরা? হেঁকে উঠল গাধা। চারজন বিরাট জন্তু বোঁ করে ঘুরে এক সঙ্গে আঙুল তুলে দেখাল—ওই হোথা!!

কিন্তু কে কোথায়? উঁইঢিবি শূন্য।

পালিয়েছে! বিশ্বাসঘাতকেরা পালিয়েছে! তর্জে উঠল বাইসন।

কিন্তু পালাতে দেওয়া হবে না। বললে গণ্ডার।

তবে খোঁজ! খোঁজ হাতি! খোঁজ গণ্ডার! তুমি বুনো মোষ আর তুমি বনের দুঃস্বপ্ন, খোঁজ সকলে। আঁতিপাঁতি করে খোঁজ—ইনাম ছ ছ আনা! চিৎকার করে নির্দেশ দিল বিদূষক গাধা।

বন তোলপাড় হয়ে উঠল। রাজার প্রত্যেক বিশ্বস্ত অনুচর রাজদ্রোহীদের খুঁজতে লাগল। প্রথমে তারা উঁইঢিবির চার পাশে খুঁজল। তারপর মাটি শুঁকে শুঁকে গাছের গুঁড়িতে কপাল ঘষে খুঁজল। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাগুলোকে খুঁজল। তারপর এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কোথাও পাওয়া গেল না।

বিশ্বাসঘাতকেরা অতএব নিশ্চিতরূপে মহারাজের ল্যাজ মুচড়ে দিতে বেরিয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত করল গাধা। চীৎকার করে বলল সবাইকে,—শীগগির চল্—আমরা গে খবর দি, দেরী হলে বুঝি সর্বনাশ হয় শেষে!

তখন পাঁচজন পশু—প্রথমে গর্দভ, তারপর বাইসন, গণ্ডার, হাতি, আর সব শেষে সেই কুচ্ছিত কিম্ভূত জন সারে সার পা ফেলে ডানে কদম, বাঁয়ে কদম করে ছুটলো রাজবাটিতে।

দশ

উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ করে কাঠবিড়ালি আর ইঁদুর গাছের ডালে বসেছিল। এ কী বিপদ! বনের এই বিষম পালোয়ান প্রাণীগুলো এমন কাপুরুষ আর মিথ্যাবাদী? নিজেরা ষড়যন্ত্র করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানো? এখন উপায়?

ইঁদুর ভেবে বলল,—চল আমরাও ওদের পিছন পিছন যাই!

সে কি? আঁৎকে উঠে তাকাল কাঠবিড়ালি। আমাদের দেখলেই ত ওরা ধরে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যদি ধরতে পারে, অবশ্যই। কিন্তু জানো কি কাঠবিড়ালি ভাই, পশ্চিম বনে ঢুকে অবধি আমার মনে হচ্ছে এই মোটা মোটা প্রাণীগুলো সব্বাই আকাট বোকা। তা ছাড়া গণ্ডার ছাড়া আমাদের আর কেউ চেনে না। আর দেখলে ত ওটা কী বেজায় ভীতু! একটু চোখ পাকিয়ে তাকালেই ও মুচ্ছো যাবে। তা ছাড়া রাজার সভায় আমরা যাব। চাই কি রাজামশাইকে আমার বংশ পরিচয় বললে,—এই বলে সে থেমে গেল।

দূরে শুঁড়ি পথ বেয়ে বাঁয়ে কদম ডাইনে কদম হাঁকতে হাঁকতে চলেছে গণ্ডারদের দল। তখন টুপ করে নেমে পড়ল গাছ থেকে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি। আকাশের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এক পশলা জ্যোৎস্না ছিটিয়ে পড়েছিল গাছের পাতায় পাতায়—সেখান থেকে টলে পড়ল ভুঁয়ে। ঘন নিঝুম গাছ আর তাদের ডাল থেকে ঝোলান কচি লতার বেণী সেই আলোয় দেখাল চমৎকার। মরমরিয়ে এক ঝলক হাওয়া বয়ে এল বৃষ্টির ফোঁটা আর শুকনো ধুলোর গন্ধে মিশে।

দূরে মিলিয়ে গেল গণ্ডারদের মস্ত চেহারাগুলো। ঝাপসা আলোয়

বড় বড় জামবাটির মত ওদের পায়ের দাগ ফুটে উঠেছে। সেগুলোই হবে ওদের পথের দিশা। আবার নিঃশব্দ হয়ে এসেছিল। দু একজন ক্ষুদে পোকামাকড় আড়াল থেকে সাড়া দিচ্ছিল। শুনতে শুনতে তারা হেঁটে চলল পায়ের দাগ ধরে।

কখনো হাওয়া বড় বড় গাছের মাথায় শব্দ তুলে বয়ে আসছিল। তার সাথে কয়েকটা কথার টুকরো কুড়িয়ে আনছিল ঃ

আচ্ছা গণ্ডার বাহাদুর, তুমি স্বচক্ষে শুনেছিলে কথাটা ?

নয় ? তবে কি অমনি বললেম ?

বলিহারি—!

কেমনতর দেখলে শত্তুরদের ?

হম্ ! এই গোঁয়ার গোঁয়ার মত।

আরে বাপ্ ! কার আতঙ্কিত স্বর।

আচ্ছা মহারাজ বাহাদুরের কাছে ইনামটা কি মোরা চাইব ?

আমার পাগুড়ি চাই ! কে বলল।

মোলো যা হাতি ! তোর আবার বুড়ো বয়সে শখ ত দেখি ভারী ! বরং একটা হরিনামের ঝুলি মেগে নিস্—শুঁড়ের আগায় ধরে জপ করবি অষ্টপহর !

না আমি পাগুড়ি চাই !

হা হা হা ! কয়েকটা কাটখোট্টা গলা ঘ্যাক ঘ্যাক করে হেসে উঠল।

হাওয়া থেমে গেল। কথার খেঁই হারিয়ে গেল।

কাঠবিড়ালি ইঁদুরের হাত ধরে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছিল তাকাতে তাকাতে। তখন পূর্ণচাঁদের আলোয় ধুয়ে ভেসে গেছে সবটুকু অন্ধকার। রাত মস্ত এক দুধের কড়া। আর চাঁদনী উথলে পড়ছিল তা থেকে বনভূমিতে। আকাশের রং ফিকে হয়ে বুকে জ্বলছিল এক স্নিগ্ধ তারা। চলতে চলতে বনশিউলির এক মুঠো গন্ধ এসে লাগল তাদের চমকে দিয়ে। মনে হল খুব ছোট ছোট শিশিরেরা গাছের পাতায় পাতায় ভীড় করে ঝুঁকে দেখছে তাদের দিকে।

হঠাৎ ছায়া থেকে কে একজন চুপিসাড়ে লাপিয়ে পড়ল তাদের পথের একটু আগে আর পথ আগলে দাঁড়াল। ভয়ানক চমকে কাঠ হয়ে থেমে দাঁড়াল ওরা।

এ কে? দেখল একরাশ কদম ফুলের কেশরের মত রোঁয়া ফুলিয়ে বসে এক হলদে বেড়াল। তার চোখ দুটো সবুজ বাতি।

খেলবি? ফিস্ করে বলল বেড়াল।

না! আড়ষ্ট গলায় বলল ইঁদুর।—আমরা এখন দূর পথে চলেছি।

কে-ন? মিয়া-ও—! কেন? মিয়া-ও—! কে-ন?

যাঃ! চুপ কর! অমন ডাকতে নেই। অস্বস্তির সঙ্গে বলল ইঁদুর।



তবে আমি খেলি, তোরা দ্যাখ! বলল বেড়াল।

কি খেলা? কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি।

ছায়া আর চাঁদের আলোর ধপধপে খেলা! এই দ্যাখ!— বলেই হলদে বেড়াল লাফিয়ে একটা চাঁদের ছোপ দেওয়া ছোট্ট গোল জায়গায় ল্যাজ ছড়িয়ে বসল। তার চোখ দুটোর একটা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছিল আরেকটা ছিল ছায়ায়। যেটা আলোয় ছিল সেটা সবজে আগুনে জ্বল জ্বল করছিল।

হঠাৎ বেড়াল দুলতে লাগল। অমনি তার চোখ দুটো ছায়া আলোর মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল গোল গোল দাগ এঁকে। দেখতে দেখতে একরাশ আলোর দাগ

ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অনেকগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগল বনের ছায়ায়। অনেকগুলো চাঁদের আলোয় গলে গিয়ে টুপ করে ঝরে পড়ল বাতাসে। কু-উ করে একটা পেঁচা ডেকে কোথা থেকে উড়ে এল আর একটা গোল আলোর বালা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে গেল!

ভয়ে কাঠবিড়ালির গায়ে কাঁটা দিল। এ কী বিষম বিদঘুটে ভুতুড়ে খেলা? বনের মধ্যে কোন সাড়া নেই। সব নিস্তব্ধ। তবু যেন নিঝুম ছায়াগুলোর আড়াল থেকে, গুঁড়িগুলোর ঘুমন্ত সারি সারি দেউড়ির খিলান থেকে, গাঢ় লতাপাতার ফাঁক থেকে আর শুকনো ঝরা পাতার রাশি থেকে কারা শিরশিরে হাওয়ার গলায় গান গাইছিল। তা ওরা কানে শুনতে না পেলেও শুনতে পাচ্ছিল মনের মধ্যে। কথা একটাও বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু মানেগুলো কেমন পরিষ্কার ধরতে পারছিল। আবার সুরটাও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল না, যদিও বাজনাগুলো অদ্ভুত রিমঝিম বৃষ্টি পড়ার মত একটানা বেজে চলেছিল। গানটার সুর আর কথা যেন এই ধরনের—

ডিং ডিং ডং ডং ডিং
ডিং ডং ডিং ডং ডিং

যেন পর্দার পর হাওয়ার পর্দা সরিয়ে মস্ত মস্ত ঘণ্টার শব্দ বয়ে যাচ্ছে দূর দূরান্তে। এমনি অনেক অনেকক্ষণ। কতক্ষণ তা সবাই ভুলে গিয়েছিল। বেড়াল খেলা থামিয়ে পিঠটা ধনুকের মত করে হাই তুলল, হা—ই!! তারপর চোখ মেলে বলল, কেমন খেলা?

খেলার মাথামুণ্ড ছাই কিচ্ছু ওরা বুঝতে পারে নি। সেই কথাটা কাঠবিড়ালি জিজ্ঞাসা করবে ভাবল। এমন সময় অনেক দূর থেকে একটা দমকা গোলমাল হুড়মুড়িয়ে কানে এল—

হৈ হৈ হৈ হৈ—ধর কানটা চেপে—ধর্ এটাকে—ধর্ ওটাকে! কেঁপে উঠল ওরা।

ও কিসের শব্দ? ফিস্ফিস করে শুধোলো হলদে বেড়ালকে।

মেলা বসেছে। বললে বেড়াল।

কিসের মেলা ?

কিসের আবার ! রাজারাজড়ার মেলা—

কিন্তু ওরা যে সবাই ধর্ ধর্ করছে ! ভয়ের গলায় বলল কাঠবিড়ালি।

চল আমরা মেলায় তাড়াতাড়ি যাই ! ইঁদুর বলে উঠল।

বাঃ ! তা কি করে হয় ! বেড়াল অনুযোগ করে বলল,—এখনও যে খেলার অনে—ক বাকি !

এ আবার কেমনতর খেলা ! মনে মনে ভাবছিল কাঠবিড়ালি।—আমাদের এ খেলা মোটেও ভাল লাগছে না।

এই ত সবে শুরু,—আপত্তির ঘাড় নেড়ে বলল বেড়াল,—ওই দেখ ওরাও তৈরী হচ্ছে !

কারা ?

ওই যে ! ওরা— ! চারিপাশে মুখটা ঘুরিয়ে বেড়াল দেখাল না-দেখতে-পাওয়া অনেককে।

তক্ষুনি একরাশ শুকনো পাতা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল তাদের মাথার ওপর। পাতার ফাঁকে ফাঁকে হাওয়া এসে বলল ঃ

এখনও অনেক বাকি ! অনে—ক বাকি ! একটা ঝুলন্ত লতা হাওয়ায় দোল দিয়ে এসে ইঁদুরের গোঁফজোড়া একটু টেনে দিয়ে আবার সরে গেল।

যাঃ ! চাপা ধমক দিয়ে বলে উঠল ইঁদুর।

দেখলে ত ? গম্ভীর চেয়ে থেকে বলল হলদে বেড়াল।

আমরা দেশ ভ্রমণে চলেছি, আমাদের খেলা করার মোটেই যে সময় নেই—বলল কাঠবিড়ালি।

আমি একটা সুন্দর দেশের কথা তোমাদের বলব।—হলদে বেড়াল একটু এগিয়ে গিয়ে একটা চাঁদের দাগের মধ্যে দাঁড়াল,—সে দেশ রাত্তিরে গলে যায় ঠিক মোমের মত। আর গলে গিয়ে পরীদের চোখের ভোমায় জমে ওঠে ফোঁটা ফোঁটা। তারপর রাক্ষসগুলো আসে তাই চুরী করতে,—বেড়াল এই বলে একটা হাত উঁচু করে দেখাল। ওরা চেয়ে

দেখল এক কালো গভীর বিরাট মেঘ নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে চাঁদটার দিকে। পিছনে পিছনে বিদ্যুতের বল্লমগুলো ঝলসাচ্ছে আকাশটাকে গিঁথে গিঁথে। গম্ভীর শব্দ গড়িয়ে এল গুর্‌র্‌র্‌র্‌! বনের অগুনতি গাছ চন্দ্রালোকে রইল স্থির।

শীগগির চল!—বলল ইঁদুর। কাঠবিড়ালি তবু পিছন ফিরে দেখছিল গুঁড়ি মেরে আসা ঘন ঘোর বিদ্যুৎকাঁপা মেঘটাকে। সে যেন কোথায় দেখেছিল···কিন্তু রাশি রাশি বনজ্যোৎস্না মন থেকে তার হরফগুলো মুছে নিয়েছে।

তোমরা চলে যাচ্ছ? হলদে বেড়াল না-কয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সবুজ চোখের বাতি দুটো তুলে। সে ছুটে চলল একটা সরু বনের পথ ধরে। অমনি শন্ শন্ করে দুরন্ত হাওয়া ছুটোছুটি করে এল ডালে ডালে। শুকনো পাতা ঝরে পড়তে লাগল তাদের গায়।

বেড়াল মশাই—একটু আস্তে দৌড়োন—আমরা পিছিয়ে পড়ছি! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ইঁদুর।

বেড়াল পিছন ফিরে চাইল। তার চোখের বাতিদুটো একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তারপর আর তাকে দেখতে পেল না ওরা।

বেড়াল ম-শাই! চেঁচিয়ে ডাকল ইঁদুর। অনেকগুলো হাওয়ার সুতো কথার খেঁইটাকে কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিধ্বনি করে উঠল বনের মধ্যে,—বেড়াল ম-শাই! কাঠবিড়ালি ইঁদুরের হাত টেনে ধরে বলল, ওই দেখ!

অনেক দূরে যেখানে বেড়াল দাঁড়িয়েছিল—তারও আগে—মনে হল কয়েকটা হলদে ডোরা কাটা দাগ আর সিধে একটা ল্যাজ। কতকটা বেড়াল মত। তারা দৌড়ল সেইদিকে। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। আবার মনে হল অনেকটা দূরে কয়েকগাছা হলদে গোঁফ ফুটফুট করছে জ্যোৎস্নায়। ঠিক বেড়ালের মত। সে দিকে এগোতেই দেখল একটা মাকড়সা একমনে সরু সরু সুতো বুনছে। তাই তো!

হঠাৎ চারিদিকের আলো হলুদ হয়ে নিভে এল। হলদে বেড়ালের

মতো তার গায়ের রং। চমকে তাকাল তারা মুখ তুলে আকাশের দিকে। সেই মেঘটার পাড়ে পাড়ে ঢাকা পড়েছে চাঁদের গা। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে সোনার ঢেউ ভেঙ্গে আলো। পিছনে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতো কালো গম্ভীর মেঘটা।

গুড়ড়ড়···র! ডাকল মেঘ। সে ডাক ওদের বুকের মধ্যে বেজে উঠল। দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে মহাবন। আলো নিভে আসছে। কিন্তু সেই রাজারাজড়ার মেলা কোথায়? হলদে বেড়াল বনের ছায়ায় মিশে রয়েছে কোথাও। কখনো তার ঝামরে ওঠা কদম-কেশর রোঁয়া দেখা যাচ্ছে, কখন তার একটা থাবা আস্তে অন্ধকারের গায় আঁচড় কাটছে। কিন্তু তার পুরোটা কখনো দেখা গেল না। হাওয়া এসে ওদের কানে তাগিদ দিয়ে গেল, ছুটে চল! তার গায় বৃষ্টির ফোঁটার গন্ধ। আর বজ্রের ঘায়ে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া অন্ধকার হাওয়ায় ভরে নিস্তব্ধতা।

ইঁদুর বলল, হাওয়া আমাদের পিছন থেকে বয়ে আসছে বলে আমরা কিচ্ছু শুনতে পচ্ছি নে।

তাই বোধ হয়। জবাব দিল কাঠবিড়ালি।

ওরা কানে হাত দিয়ে হাওয়াকে আড়াল করে ধরে শুনতে পেল একটা বিষম সোরগোল। খুব জোরে নয়, তবে অনেক গলায়।

ওই সভা বসেছে। চলো শীগগির! বলল ইঁদুর।

এই! এই! দপ করে ছুটো সবজে বাতি জ্বলে উঠল তাদের সামনে।

এই! বলল হলদে বেড়াল, তোমারা খেলছ না কেন?

এ আবার কেমনতর খেলা? তোমার সবটা লুকিয়ে রাখলে খেলব কি করে? বলল কাঠবিড়ালি।

তা ছাড়া আমরা এখন রাজাদের মেলায় যাব। বলল ইঁদুর।

তা ছাড়া আকাশে কি ভয়ানক মেঘ করেছে!

কিন্তু তোমরা গেলেই যে খেলা শেষ হয়ে যাবে? বললে বেড়াল। তা হলে?—বলে সে সবুজ চোখের বাতি ছুটো তুলে ধরল উপরের দিকে।

আর একটা দমকা হাওয়া আছড়ে নেমে এল বনের প্রকাণ্ড গাছগুলোর ডালে ডালে। নেচে উঠল ডালপালা ঝড়ের হাওয়ার ঝাপটায়। শুকনো পাতা খড় খড় আওয়াজ করে ছুটল তাদের পাশে।

বেড়াল মাশাই!—চেঁচিয়ে ড়াকল ইঁদুর। কিন্তু হলদে বেড়াল চুপটি করে বসেছিল। তার চোখদুটো অন্ধকারের ঢেউ লেগে নিভে আসছিল। তারা অবাক হয়ে দেখল হাওয়ায় তার রোঁয়াগুলো খসে খসে উড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কেবলই ছোট হয়ে আসছিল বেড়াল। ওরা দৌড়ে গিয়ে হলদে বেড়ালের যতটুকু ছিল তার কাছে এসে ডাকল—ও-বেড়াল মশাই! আপনার যে স—ব্ উড়ে গেল!

বেড়াল কি একটা জবাব দিল বোঝা গেল না। কিন্তু তক্ষুনি আর একটা দমকা হাওয়া এসে তার খানিকটা আরো খসিয়ে উড়ে যেতেই ইঁদুর হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সেটা।

কিন্তু যাঃ!

এ যে কেবল শিমুল তুলো!

হলদে বেড়াল মাত্তর একটুখানি শিমুল তুলো। হু হু ঝড় এসে তাকে নিয়ে চলে গেল।



এগারো

ওই বুঝি রাজবাড়ির পাঁচিল। সামনে বন ঝাউয়ের সার ছু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে। ওরা শুনতে পেল,—

—অতঃপর বিশ্বাসঘাতকেরা—, বলছিল কে একজন মোটা হেঁড়ে গলায়।

ঝড় থেমে গেছে। মেঘের গা ভেঙ্গে ভেঙ্গে মোমের মত আলো বেরিয়ে আসছে। আকাশের তারা-ঝলমল গায়ে স্বপনের ওড়না জড়িয়ে দিচ্ছে।

—অতঃপর বিশ্বাসঘাতকেরা তোমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল ? বললে হাঁড়ি-গলা ধমকে উঠে।

আজ্ঞে না হুজুর ! আমি চোখ ক—যে এঁটেছিলুম ! ধুলো তাই ঢুকতে পায় নি এট্টুও !

চোপরও ! মস্করা হচ্ছে !—ভীষণ চটে উঠে রাজমোক্তার একটা হাণ্ডেল চড়ানো চশমা চোখে তুলে চিরে চিরে চাইল।

ইঁছুর আর কাঠবিড়ালি এসে দাঁড়িয়েছিল মস্ত এক খোলা জায়গায়। কে বিশ্বাসঘাতক ? কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা ছুজন। যে জবাব দিচ্ছিল তার গলাটা খুব চেনা। ওই কি তবে রাজসভা ? আবছায়ায় আরও কাছে এগিয়ে গেল ওরা।

মস্ত ইমাম দরবারের মত চারিদিকে গোল হয়ে গাছের সার। মধ্যে লম্বা লম্বা পাথরের চাতাল বেঞ্চির মত পাতা। একটা উঁচু জাহাজের ডেকের মত জায়গা সমুখে। সেখানটা মনে হল বিচারকদের বসবার ঠাঁই। বাঁপাশে একটা দোলনায় হাত পা ছড়িয়ে শিম্পাজী দোল খাচ্ছে। গায় তার গলাবন্ধ কালো কোট। চোখে চশমা। ইনিই বুঝি রাজমোক্তার।

কিন্তু সবচেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল সভার মাঝখানটায় যা রয়েছে তা চোখে পড়ায়। একটা প্রকাণ্ড চুল্লী গনগনিয়ে জ্বলছে। চুল্লীর মুখে আস্ত মোটা মোটা গুঁড়ি পুরে দেওয়া। আর প্রকাণ্ড গোল ডিমের মত একটা কালো কড়াই, তা যে কত বড় তা প্রথমে দেখে বোঝাই যায় না। তার মধ্যে টগবগ করে ফুটছে কালো কুচকুচে তেল। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা কড়াইয়ের গা চেটে চেটে দিচ্ছে—ধোঁওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উগরে উঠছে গমকে গমকে। সেই ফুটন্ত তেলের মধ্যে মাত্তর খাঁড়াটুকু বার করে চোখ পিটপিটিয়ে চেয়ে সেদ্ধ হচ্ছেন গণ্ডার মশাই! পরম নির্বিকার!

বেশ হয়েছে! ফিস্‌ফিস্ করে বলল ইঁদুর।

চুল্লীর হলুদ শিখা কেঁপে কেঁপে পড়ছিল ডানপাশে দাঁড়ানো তিনটে বড় বড় ছায়ার ওপর। ভাল করে চেয়ে ওরা দেখতে পেল, তার একটা হাতি, একটা বুনো মোষ আর অন্যটা সেই বিদঘুটে প্রাণী যার মুখ স্বপ্নে দেখলে দম আটকে আসে। তারা শিং নীচু করে দাঁড়িয়ে, শুঁড় অবনত করে, চোখ নীচের দিকে তাকিয়ে। দোলনা থেকে ভারী কাঁধ রাশভারী কেতায় উঁচু করে কটমটিয়ে চেয়ে রয়েছেন রাজমোক্তার কড়াইটার দিকে। আর ঠিক বিচারকদের সামনে একটা রেলিং দেওয়া কাঠগড়ায় নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে আছে গর্দভ। মাঝে মাঝে চাট্টি শুকনো ঘাস পকেট থেকে বের করে আলগোছা মুখে ফেলে দিচ্ছে।

পিছনে ত্রিশূল গাছগুলোর সারিতে পিঠ করে উঠেছে এক অতিকায় পাথরের স্তূপ। সেটা সিংহাসন। তার গায় বড় বড় সিংহের থাবা খোদাই করা। সিংহাসন শূন্য।

কাঠবিড়ালি ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—দেখেছ কেমন ফাঁদে পড়েছে বদমাইসগুলো! ভেবেছিল পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ওরা রেহাই পাবে। এখন নিজেরাই আসামী বনেছে।

—এবার জবাব দাও ত বাছা, তুমি কে—নো চোখ শক্ত করে এঁটে

ছিলে ? অনেক ভেবে রাজমোক্তার হঠাৎ গঙ্গাজলী-জালা গলায় প্রশ্ন করল কড়াইয়ের দিকে।

বাঃ! চোখে ধুলো ঢুকতো যে! ফিক করে হেসে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল গণ্ডার।

ইঃ! বেগুনের মত চোখ করে তাকাল রাজমোক্তার,—রাস্কেল! অপরাধ স্বীকার করবি নে তবু? এদিকে মহারাজের খিদেয় পেট চাঁই চাঁই করছে!

তেলের মধ্যে থেকে চোখ মুদে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল গণ্ডার। সভাস্থল নিঃসাড়। কি হয়, কি হয়!

ইঁদুর বলল, না ভাই, আমার কিন্তু রকম-সকম মোটেও ভাল লাগছে না। আমার সন্দ হচ্ছে এটা আদপেই বিচার সভা নয়। বস্তুত ভাবসাব কেমন ভোজসভার মতই ঠেকছে! বলে চারিদিকে তাকাল সে।

অবাক ভাবটা ওদের কেটে গিয়েছিল। ওরা দুপা এগিয়ে গিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখল পরিবেশটা। অনেক পশুপক্ষী জমা হয়েছে সভাস্থলে। তারা সবাই বেঞ্চিগুলোয় বসে বিচার মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তাদের চেহারা দেখে রক্ত হিম হয়ে আসে। যেন কতকাল এ দেশে বৃষ্টি পড়ে নি। রুক্ষ হাড় বের করা প্রাণীরা রক্ত চোখে সভার বিচার দেখছে। সকলের দৃষ্টিতে খিদে আর হিংস্রতা। জুরীদের চোখগুলোও তেমনি জ্বল জ্বল করছে। পিছনে গভীর বনের অন্তরাল থেকে নিঃশব্দ পায়ে এক একজন হিংস্র পশু এসে যোগ দিচ্ছে সভাতে। থমকে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দেখছে কড়াইটার দিকে। তারপর গণ্ডারকে দেখে মুখ ভার করে এসে বসছে বেঞ্চিতে। ক্রমে এক আধটা টুকরো আলাপ কানে এসে পৌঁছল। কখনো চাপা কথাবার্তা গর্জন করে উঠছিল।

—মহারাজের দেখা নেই! এ ধারে জারি-জুরী সাক্ষীসাবুদ সবাই নাক ছিকেয় তুলে বসে থাকবে নাকি রাতভোর?

এ ভারী বেব্যবস্থা! মামলা শেষ করে আসামীদের পাতে দাও! তা না, এই ঠিক্ রেতে দগ্ধে মারা!

আসামী কাকে বলিস র‍্যা? ফুসে উঠল একজন,—জন্তু মাত্তেরই আসামী, এ হক্ কথা! ম'রাজের কিরপা হলেই পেটে কিছু পড়ে।

ছাই পড়ে! তোলা ধরতে পারে যারা তারা মুড়ি খায়, পিলে খায়, ফুসফুসগুলো চুষে খায়। মোদের বেলা যতেক হাড়গোড়!

আর ওই অখন্তে গণ্ডারটাকে এবার নিয়ে চুরাশিবার তেলে চড়াল আর নাবাল। ওটা সেদ্ধ হবে না তবু। স্বয়ং মহারাজের নখ ভোঁতা হয়ে গেছে ওর পিঠ আঁচড়ে—!

তার চে' তোর পিসতুতো ভাইটাকে চাপালেই ত পারে! বললে ঘাড় ফিরিয়ে একজন,—ওর গায়ে চর্বি ধরছে না। খেতেও মোলাম হোত!

খাসা সরেস হোত! সায় দিল আরেকজন। দুজনে জ্বলজ্বল করে তাকাতে লাগল অন্যদিকে বেঞ্চিতে বসা মোটাসোটা এক পশুর দিকে।

কথাটা কি করে যেন ছড়িয়ে পড়ল। অমনি সেই আবছা আঁধারে জোড়া জোড়া চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। হাস্ হুস্ করে সবাই জিভে জল টানতে লাগল, সিঁক সিঁক করে বাতাসে তার গায়ের চর্বিল গন্ধ ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

যার মোটাসোটা নধর শরীরখান দেখে জমায়েত আমিষাশী পশুরা সেদিন আহ্লাদিত হয়ে উঠেছিল সে কিন্তু তা কিচ্ছু জানতে পারে নি। এক চোখ বুঁজে বেচারী একটু হরি গুণগান ভাঁজছিল বেঞ্চিতে খোল বাজিয়ে। সে হল ভোঁদড়। জাতিতে গোস্বামী। অন্য পশুদের মত চারপায়ীদের মাংস সে খায় না। জলে ডুবে ডুবে মাছ খায়। আর যেহেতু আর সকলে তার মত মাছে ভাতে খেতে জানে না, তাই তার আহারের পরিমাণটা সব সময়ে একটু পর্যাপ্ত। চর্বি তার শরীরে তাই একটু বেশি। যা হোক, ডাঙ্গার জীবেদের সঙ্গে তার ভাব প্রণয় ভয়ানক। দিনের শেষে এক দণ্ড আড্ডা না দিতে পারলে তার পেটের মাছ হজম হয় না একটুও। রাজসভায় একমাত্র সেই আসে যার খিদে

নেই। আসামীদের মাংস সে ছোঁয় না। যদি অন্য সবাই পেড়াপীড়ি করে প্রসাদ নেওয়ার জন্যে বলে কপালে ঝুলিটা ঠেকিয়ে,—গুরুর বারণ!

পরম বৈষ্ণব আমাদের ভোঁদড়। কপালে ফোটাচটা রসকলির অন্ত নেই। গলায় তুলসীর মালা। গা সদাই খালি, যদিও একটা ফতুয়া সে এঁটে আসে যার নীচে থেকে চকচক করে নধর ভুঁড়িখান মাজা পেতলের হাঁড়ির মত। আর সেই পুরুষ্টু ভুঁড়িতে চেয়ে সেদিনের সভার যতেক হিংস্র প্রাণী খিদেয় ছটফট করতে লাগল। একজন আর থাকতে না পেরে উঠে এসে ছুঁচলো নাকের ডগা ছুঁইয়ে ভোঁদড়ের ভুঁড়িটা দুবার স্নিক স্নিক করে শুঁকলো। অমনি আগুনে ঘি পড়ার মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল খিদে। তখন সেই আহাম্মক প্রাণী তার খাইমুখের বাঁ কোণের একটা ধারালো দাঁত বার করে কুট করে কামড়ে দিল ওর ভুঁড়িতে।



আ হা হা!—হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল গোস্বামী ঠাকুর। পাশ ফিরে দেখে একটা হাড়-হাভাতে হাড় জিরজিরে বনকুত্তা তার তরিবতের ভুঁড়িটা চাখছে। হা-হা করে কেঁদে উঠল ভোঁদড় গোঁসাই।

গোবিন্দ! হায়! হায়! পাষণ্ডটা আমায় উচ্ছিষ্ট করে দিল! মধুসূদন! বিনা অপরাধে দাসকে কেন খাওয়াবার বিধান করলে প্রভু!

তুমি আদৎ অপরাধী! গর্জে উঠল শ্বাপদেরা,—তোমায় আসামী সোপর্দ করে আমরা খাব!

হায়! হায়! হায়! কাঁদতে লাগল ভোঁদড়।

হা হা হা হা! বিকট হেসে উঠল গণ্ডার কড়াই থেকে।

এই! চোপরও সব্বাই! এক্ষুনি ১৪৪ ধারা জারী করব শান্তি ভঙ্গ করলে! পিলপের উপর চড়ে রাজমোক্তার সাবধান করে দিল।

হায়! হায়! হায়! কাঁদতে লাগল ভোঁদড়। কিন্তু তার কান্না শুনে কারও প্রাণ গলল না। জন কত উঠে এসে ঘাড় ধরে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ের কাছে।

এস! ভাই এস! গদগদ চোখে মুখ বাড়িয়ে বলল গণ্ডার।

হায়! হায়! দ্বিগুণ ফুঁপিয়ে উঠল ভোঁদড়।

পিলপের মাথা থেকে শিম্পাঞ্জী হাণ্ডেল দেওয়া চশমা তুলে কঠিন চোখে তাকাল।

নিয়ে যা বেটাকে ধরে! বেটা কাফের! বোষ্টম!—তখন দুজন ষণ্ডা জানোয়ার খপ করে চেপে ধরল ভোঁদড়ের দুটো মোটা গোলগাল হাত।

তেলমে ফেকো উস্‌কো—! একজন হাবিলদার পিছন থেকে হুকুম দিল।

ন্যায়ের রাজ্যে বেয়াদপি! ভোঁদড়া! তোর আস্পদ্দা ত ভারী! ধিক্কার দিল চারিদিক থেকে।

দেয়ালে লিখে দাও, বিশ্বাসঘাতকের শত সহস্র পাপের ফিরিস্তি মোটা তুলি দিয়ে!

কোলপাঁজা করে তুলে ধরল ওরা ভোঁদড়কে কড়াইয়ের কানায়। তখন আর্তকণ্ঠে ডাকতে লাগল ভোঁদড় জগদীশ্বরকে,—হে মধুসূদন! রক্ষা করো প্রভু, আমায় পোরের ভাজা করে খেয়ে ফেলল এরা!

কিন্তু জগদীশ্বর যেমন আর পাঁচটা জায়গায় বেকায়দা দেখলে চুপটি করে থাকেন তেমনি এ ক্ষেত্রেও ভক্তের ডাকে টুঁ শব্দ করলেন না।

টপ টপ করে ভোঁদড়ের চোখের দুকোণ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গরম তেলে। ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হতে লাগল।

ও—ও—ভাই ইঁদুর! ওরা যে ভোঁদড়কে খাওয়ার উয্যগ করছে! কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করল কাঠবিড়ালি।

সত্যি! অন্ধকার গলায় বলল ইঁদুর। হঠাৎ সভামণ্ডলী নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এক ধারে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে গর্দভ সব লক্ষ্য করছিল। ঠিক যেই সকলে একটা তুমুল হর্ষধ্বনি করে ভোঁদড়কে তেলে ফেলবে—গর্দভ ধীর গম্ভীর পা ফেলে এসে দাঁড়াল রাজসিংহাসনের নীচে। ডাইনে থেকে বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে শুরু করল,—

—মহারাজাধিরাজ বনপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্যাঘ্রচন্দ্র বাহাদুর পদাম্বুজে শতকোটি নমো নমহঃ! অনুগত শ্বাপদ সন্তানেরা! অদ্য অস্তচন্দ্র লগ্নে সভার কর্ম শুরু হচ্ছে। মহারাজাধিরাজের সুশাসনে এই মহাবনে সকল জীব পরম হিতে এখানে বাস করে। কারও কোনো অভিযোগ নেই। অত্র প্রত্যেক আসামীর ন্যায় বিচার হয়, আসামী হয় প্রত্যেকে। ন্যায়দণ্ড অনুযায়ী প্রাণদণ্ড হয়। আমাদের প্রগাঢ় বুদ্ধিমান বিচারকমণ্ডলী,—বলে গর্দভ চোখ চিতিয়ে চাইল বিচারকদের আসনে বসা নেকড়ে আর হায়নাদের দিকে,—যথার্থ দণ্ড বিধান করেন। এতে কারও দ্বিমত ও অভিযোগ নেই—

নেই! নেই! গর্জে উঠল সভার সকলে,—প্রাণদণ্ড না হলে কি বিনাদস্তুরে খাওয়া হয় আসামীদের?

বন্ধুগণ! এই বিধির বলে মহারাজের রাজ্যে সকলেই কেঁচো হয়ে থাকে। সকলে পেট ভরে ভোজন করে। সকলে আনন্দে বাস করে!

আ—নন্দে! জয়ধ্বনি করে উঠল সবাই। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী এত কথা মোটেই পছন্দ করছিল না।

প্রমাণ হাজির কর ভোঁদড় আসামীর বিরুদ্ধে—! হেঁকে বলল হায়না।

আইনের কথা হোক! অপরাধ কি কি? নেকড়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করল।

ও-ই আসামী! চীৎকার করে জবাব দিল সকলে।

তবে ঠিক ! তেলে নামাও ওকে। তারপর স্বীকারোক্তি টুকে রাখ।

আর সাজা ? অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল সকল জীব।

মৃত্যুদণ্ড !!

জয় ! জয় ! জয় ! মহারাজাধিরাজের জয় ! জয়ধ্বনিতে নিশীথের বুক কেঁপে উঠল। সে আজ্ঞা বয়ে নিয়ে গেল হাওয়া, ছায়া-ছায়া বিরাট গাছগুলোর অন্ধকারে।

সবুর ! চেঁচিয়ে উঠল রাজার বিদূষক। সকলে চমকে তাকাল তার ছেয়েরঙা মুখের দিকে,—আমি একটা ভয়ানক খবর এনেছি।

এ্যাঁ—? বিরক্ত হয়ে সবাই রাজসাক্ষীর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

হ্যাঁ ! বন্ধুগণ, আপনারা শুনে রাখুন, আমাদের এই সুখী বনভূমি আজ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে ভরে উঠেছে।

ব—লো কি ? ভয়ে বেগ্‌নী হয়ে তাকাল চোখের বাতিগুলো।

এ—বং,—এই সভাতেই তারা জেঁকে বসে রয়েছে।

কী সর্বনাশ ! চীৎকার করে উঠল সকলে,—এই সভাতেই ?

এই সভাতেই ! কঠোর গলায় বলল গাধা।

তখন একটা ভয়ানক উসখুসে ভরে উঠল সভা। সকলে সকলের চোখের পাতার নীচে চেয়ে চেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকল। সকলে সকলের মনের ভিতর ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,—এই, তুইই তবে বিশ্বাসঘাতক, তুই আসামী ?

কড়াইয়ের কানার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভোঁদড় গলা বাড়িয়ে গণ্ডারের কানে কানে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁ ভাই, তুমি নাকি ?

গণ্ডার মুখ উঁচিয়ে বলল,—আমি জানি কিন্তু বোলবো না !

অমনি চকচকিয়ে উঠল ভোঁদড়ের চোখ। হরিনামের ঝুলিটা কপালে ঠেকিয়ে ফস্ করে দুটো জপ সেরে সে এক চোখ অল্প খুলে জিজ্ঞাসা করল,—সত্যিই ওরা বিশ্বাসঘাতক ? গোবিন্দ ! কি ভয়ংকর কাহিনী !

গণ্ডার বলল,—কেউ জানেনা !

শুনে ভোঁদড় আরও ছটফট করে বলল,—বল্ না ভাই ! কে ? হাতি ?

উঁহু !

তবে মোষ ?

হল না !

একটু ভেবে আধুলির মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে ভোঁদড় বলল, তবে কি উনি, ওই যাচ্ছেতাই দেখতে ?

পারলে না !

গোমড়া মুখ করে গুম হয়ে রইল ভোঁদড়। এদিকে বিচার মুলতুবী থাকায় যারা তাকে এতক্ষণ কড়াইয়ের কানায় উঁচু করে তুলে ধরে ছিল তাদের কাঁধ টন টন করছিল। তার ওপর যখন দেখল ভোঁদড় মন খুলে খোশ গল্প করছে, তখন সেই যণ্ডা মার্কা জন্তু দুজন ভীষণ রাগ করল। শুনতে পেল ভোঁদড় বলছে গণ্ডারকে—দেখেচিস্ ! তুই যখন তেলে ভাজা-ভাজা হচ্চিস্ তখন আম্মো কেমন কুলি দুটোর কাঁধে চেপে আরাম কচ্চি !—শুনে ওরা বুঝলো যে একটা বিষম বোকামো করেছে। অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে ভোঁদড়কে ফেলে এক দৌড়ে ফিরে গেল তারা।

হরিবল্ ! ঝুলিটা কপালে ঠেকিয়ে চতুর্থীর চাঁদের মত একগাল হাসল ভোঁদড়। তারপর ফিরে গিয়ে বসল সখের জায়গাটিতে।

সভার ঘটনাগুলো এত জমাট হয়ে আসছিল যে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি কখন এক পা এক পা করে এগিয়ে গেছে কড়াইয়ের কাছে তা জানতেও পারে নি। ভোঁদড়ের মুখখানা কড়াইয়ের কানায় হঠাৎ অস্ত যেতে দেখে গণ্ডার তাড়াতাড়ি কানার ওপর পা তুলে চাইল নীচে। অমনি তার চোখ দুটো প্যাটপেটিয়ে রইল কাঠবিড়ালিদের চোখে।

এ্যাঁ—! ফিসফিস করে বলল গণ্ডার।

ওরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমাদের দেখে ফেলেছি !

ইঁদুর তাড়াতাড়ি ওর কোমরে গোঁজা পিস্তোলটা চেপে ধরল।

গুড়ুম করে উড়িয়ে দোব তোর খাঁড়া !—ঠকঠক করে কেঁপে বলল সে।

তোমাদের গ্রেফতার করব! গরম তেলে ফুটতে ফুটতে বলল পয়লা আসামী।

মিথ্যাবাদী! প্রবঞ্চক! ধিক্কার দিয়ে উঠল কাঠবিড়ালি।

এ্যাঁ! আবার গালি দেওয়া হচ্চে! নিজে না বিশ্বাসঘাতকতা করে—এ্যাঁ!

ফের মিথ্যে কথা বলচিস্! ধমকে উঠল ইঁদুর।

মুখ কাঁচ্‌মাচু করে চুপ করে রইল গণ্ডার। এদিকে এত জোরে ফিস্ ফিস্ চেঁচামেচি শুনে সভার সমস্ত পশুরা এগিয়ে এসেছিল কড়াইয়ের চারিপাশে। কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছিল কেবল গণ্ডারকেই।

কি হয়েছে? কি ভাই গণ্ডার! সকলে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

আমায় গালি দিচ্চে! ফুঁপিয়ে বলল গণ্ডার।

এ্যাঁ! কে গালি দিচ্চে আমাদের গণ্ডারকে? সকলে চোখ ঘোল করে জানতে চাইল।

—বলছে গুড়ুম করে গুলি করবে! ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল গণ্ডার।

যাট! যাট! মরে যাই! কে সে আহাম্মক!—দাঁত কিড়মিড় করে সকলে জিজ্ঞাসা করল,—আহা বাছার মুখখানি যেন কালি হয়ে গেছে!

সকলে মিলে তক্ষুনি গণ্ডারের জালার মত শরীরটা নামিয়ে আনল কড়াই থেকে। গা থেকে সমস্ত তেল মুছিয়ে দিল। তারপর হাত বুলিয়ে দিল গণ্ডারের চামড়ায়। একটু সুস্থ হলে পরে সবাই জিজ্ঞাসা করল চারিদিকে ভীড় করে,—কে? কোথায়?—কে তারা?

তখন বনের গাছপালা ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাত-অন্ধকারে। হাওয়া পাতায় পাতায় কানাকানি করে যাচ্ছিল মিথ্যে কথা বলে। চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছিল। মেঘে ঢাকা। তার ঘুম-বিরহিত আভা স্বপ্নের ইমারতে

দেয়ালে দেয়ালে দাগ বুনে বিভোর পায় পার হয়ে যাচ্ছিল। আর প্রহরগুলো জড়ো হয়ে ভীড় করে এসেছিল সেই সময়ের ফোঁটাটুকুতে। এমন সময় ডাক এল,—যেন অনেক দূরে আর অনেক কাছে থেকে, যেন সকলের মনে একরাশ কালো ফিতে ছুঁড়ে দিয়ে—**হুম্ !!**

ওই মহারাজার ঘুম ভাঙল! শিউরে উঠে বলল সকলে। সকল চোখগুলো ফিরে ফিরে চাইল। অন্ধকার বন ঝাউয়ের গাঢ় দেয়ালের মাঝখানে একটা সুড়ঙ্গ হাঁ করে উঠল আর তার বুকে মোলায়েম মখমলের মত পায়ের শব্দ পড়তে লাগল। হুলকি চালে তোম্বা তোম্বা পা ফেলে হঠাৎ দেখা দিলেন—তিনি!

ওরা দেখল,—প্রকাণ্ড এক অন্ধকার গুহার মত তাঁর মুখ, বিপুল তাঁর শরীর, কামারশালে পেটা ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। তাঁর গায়ের ডোরা দাগ ঘুটঘুটে রাতে স্বপ্নের মত হলুদ আলোয় কালো হয়ে এঁকে-বেঁকে খেলে বেড়াচ্ছে। আর তাঁর জোড়া চোখ প্রান্তরে আগুন লাগার মত চেয়ে দেখছে, দিগন্তে ওৎ পেতে।....

বার



বন্দে পুরুষোত্তম! পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁকে অভিবাদন করল গাধা।

জয়! জয়! হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠল জমায়েত সকল হিংস্র জন্তুরা;

জয়! প্রভু ব্যাঘ্রেন্দ্র বীরেন্দ্র রাজচক্রবর্তী পশুকুল শাসক মহারাজাধিরাজের জয়!

হরিবল! হরিবল! হরিনামের ঝুলি হাতে উঠে দাঁড়াল ভোঁদড় গোঁসাই। সে-সম্মিলিত জয়ধ্বনিতে বনের বুক পেতলের ঘণ্টার মত কেবলই কেঁপে উঠতে লাগল।

তখন রাজা নিঃশব্দে লাফ দিয়ে চড়ে বসলেন সিংহাসনে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই মাসতুতো পিসতুতো ভাই সিঙ্গি আর চিতা যারা সাথে সাথে এসেছিল, ডাইনে বাঁয়ে থাবা গেড়ে বসল। পিছনে জাগুয়ার মুখ তোলো হাঁড়ি করে বসল। পায়ের কাছে পুমা ঘাড় তুলে শুয়ে রইল। মাঝরাত্তিরে চতুরঙ্গ রাজসভা শুরু হল।

সিংহাসনে বসে রাজা চোখ মুদে রইলেন। অমনি সকলের মনে হল রাজা চোখ বোঁজে কেন। সকলে গলা বাড়িয়ে কথাটা হাতির প্রকাণ্ড

কানে জিজ্ঞাসা করল। হাতি বলতে না পেরে শুঁড় বাড়িয়ে সেই বিদঘুটে অসম্ভব প্রাণীকে জিজ্ঞাসা করল।

তাইত! রাজা চোখ বোঁজে কেন? সকলে ভেবে খুন। তখন এক ভীষণ অজগর সাপ দশ হাত উঁচু হয়ে বলল,—মহারাজা চোখ বুঁজে আছেন কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

অমনি বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। সকলে বলতে লাগল,—তাহলে রাজকার্য কি—চ্ছু দেখা যাবে না যে!

সকলে মনে মনে কথাটা জিজ্ঞাসা করল রাজাকে,—হাঁগো রাজা! চোখ বুঁজে থাকলে রাজকার্য দেখা যায় কি?

সিংহাসনে বসা রাজার মুখ গুহার মত স্থির। আর একদিকে আকাশের চাঁদোয়া ভরে টিপ টিপ করে জ্বলছিল তারা। অনেক দূরে গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। হাওয়া বয়ে এল বৃষ্টির কথা বলে। সিঙ্গি উঠে দাঁড়িয়ে সেই যেখানে চাঁদ কালো মেঘের ডানায় মুছে যাচ্ছিল, সেদিকে চেয়ে একটা গভীর ডাক দিল। বনের পাতায় পাতায় সে ডাক নাকাড়ার মত বেজে উঠল। রাজা চোখ তুলে চাইলেন আকাশের দিকে।

কাঠবিড়ালির মনে হল সে যেন শুনেছিল তেমনি কার গলা। হয়ত চিন্তামণি তীরে তার বাদামগাছের কোটরটিতে সে যখন মোমবাতির নরম আলোয় পড়ত একটা মস্ত কেতাব যার শেষ নেই।

রাজা চেয়ে থেকে বললেন,—আমার আকাশ লণ্ঠনে কালি দিয়েছে কে?

অমনি চিতা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল,—রাজা বলছেন তাঁর আকাশবাতিতে ঝুলকালি পরিয়েছে কে?

সবাই মুখ উঁচু করে মেঘে ঢাকা চাঁদটার দিকে তাকাল। কাঠবিড়ালির মনে পড়ল সেদিন পূর্ণিমা। তার নদীর জলে খসখসের সরু সরু ছায়া কেঁপে ওঠে পূর্ণিমায়। আর খোয়াইয়ের মত ভেঙ্গে পড়ত পূর্ণচাঁদের গা।

রাজা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন। সবাই ভয় ভয় তাকাতে লাগল

সেদিকে আর একবার যেখানে চাঁদটা সরে যাচ্ছিল কালো মেঘের আড়ালে একটু একটু করে। উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল সকলের প্রাণ—তাইত, যদি এক্কেবারে নিভে যায়? রাজার আকাশ লণ্ঠন?

গণ্ডার গুটিগুটি কখন এসে দাঁড়িয়েছিল কাঠবিড়ালিদের পিছনে। তার বারকোষের মত মুখখানা তাদের মাঝে নামিয়ে এনে বলল ফিসফিস করে,—আমি জানি ম'রাজের বাতি কে কালি করেছে।

ইঁদুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল—কে? একটুও বিশ্বাস হচ্ছিল না গণ্ডারকে। এত মিথ্যে কথা যে বলতে পারে!

হাতি! আড়চোখে তাকিয়ে বলল অপর জন।

হাতি?

হুঁ!

যাঃ! হাতি কেন দেবে। বিরক্ত হয়ে কাঠবিড়ালি বলে উঠল,—আর ওটা রাজার লণ্ঠন মোটেই নয়—দেখছ না চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে!

এ্যাঁ! রাজলণ্ঠন বলে লণ্ঠন নয়? চাঁদ? আমি বলছি হাতিই এখন আসামী হবে!—গণ্ডারের ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো চিকমিক করে উঠল দুষ্টুমীতে,—আমি পষ্ট দেখেছিলুম হাতি শুঁড়ে করে জালা জালা কালি সাঁঝ রেতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল চাঁদের গায়। তাই না এত কালো হয়ে গেছে বাতিটা! সবাই এখন কড়াইতে ওকে চড়িয়ে দেবে। কি মজা! ফূর্তিতে পা দাপিয়ে যেই গণ্ডার একটু নেচে নেবে, অমনি—

বদমাইস! লক্ষীছাড়া! আমি রাজার সোনার মাকড়ি চুরি করেচি? মিথ্যে বলা আমার নামে? চমকে পিছন ফিরতেই দেখল কখন নিঃশব্দে হাতি এসে শুঁড়ের আঙুল দিয়ে খপ্ করে গণ্ডারের কান চেপে ধরেছে! তার কুলো কানে একটা কথাও ফস্কাবার উপায় নেই।

আরে না না! তা বলিনি! এই ছাড় বলছি! উঃ লাগে! গণ্ডার চেঁচাতে লাগল।

রাস্কেল! মিথ্যাবাদী! রও আজ মজা দেখাই তোর! কেবল চুকলি খাওয়া! জালার মত ফুলতে লাগল হাতি রাগে। গোলমাল

শুনে সভার পশুরা সব এগিয়ে এসেছিল সে দিকে। হট্টগোলে ভরে উঠল সভা।

এই! আসামীরা ওখানে ভীড় করছে কেন? সিঙ্গি উঠে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল,—মহারাজের ভাবনায় ব্যাঘাত হচ্ছে।

তাই শুনে শিম্পাঞ্জী তাড়াতাড়ি পিলপে থেকে নেমে এসে টানাটানি করে সকলকে কড়াইটার দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

হাতি কালি করে দেছে ম'রাজের লণ্ঠন! আমি দেকিচি! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গণ্ডার।

জিভ খসে যাক তোর! আরও জোরে কান টেনে বলল হাতি।

হালুম!!—পাহাড় ভাঙা আওয়াজে ধড়াস করে উঠল বনের বুক। থেমে গেল সব শব্দ। আঁৎকে সবাই চোখ বুঁজে তাকাল সিংহাসনের দিকে।

রাজা উঠে দাঁড়িয়েছেন। গন গন করছে তাঁর চোখে নীল আগুন। ঝলসে পুড়ে যেতে লাগল সকল জন্তুদের পিঠগুলো। সভা নিঃসাড় হয়ে রইল।

কি?—কেন?—কখন?—কে?—কাকে—? বজ্রস্বরে প্রশ্ন করলেন রাজা।

হাতি গণ্ডারের দিকে শুঁড় দেখিয়ে বলল,—এই যে! এ বিশ্বাসঘাতক!

একটাও কথা না বলে অমনি সবাই ছুটে এসে গণ্ডারকে ধরাধরি করে ছুঁড়ে ফেলে দিল কড়াইয়ে মধ্যে। ছপাৎ করে ছিটকে উঠল তেল। গণ্ডার চেঁচিয়ে খাঁড়াটা হাতির দিকে দেখিয়ে বলল,—মহারাজ ও বলেছে কি না—

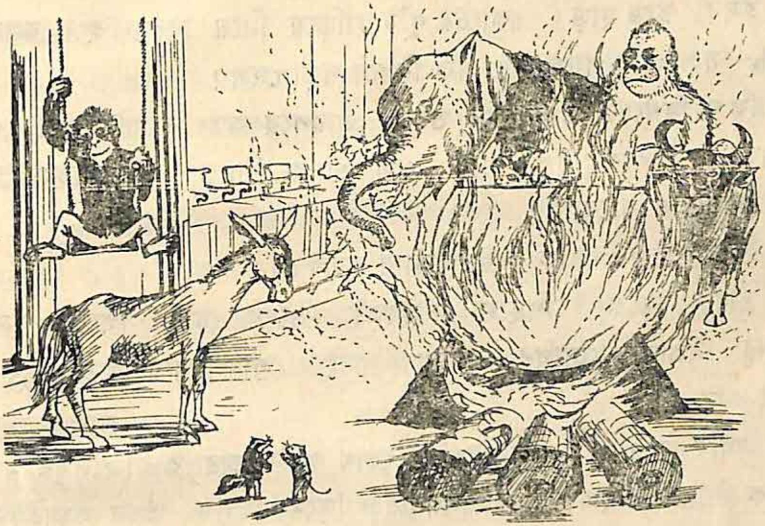
বিচার হোক! গর্জে উঠল জাগুয়ার।

তখন সবাই হাতির কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এসে তাকেও কড়াইতে তুলে দিল।

এমন সময় শিম্পাঞ্জী পিলপের ওপর থেকে সেই বিকট জানোয়ারের

দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,—মহারাজ! ওই ওর মুখটা একটু চেয়ে দেখুন, কেমন পাজি পাজি দেখাচ্ছে—!

তবেরে বদমাইস! বলে সেই ঘোর রাতের দুঃস্বপ্ন প্রাণী ছুটে এসে শিম্পাঞ্জীকে কোল পাঁজা করে এনে কড়াইয়ের গরম তেলে শুইয়ে দিল।



কিন্তু তক্ষুনি বুনো মোষ দৌড়ে এসে এক শিংয়ের গুঁতোয় তাকে একেবারে কড়াইয়ের মাঝখানে ঠেলে দিল। তারপর নিজেও চড়ে বসল।

কড়াই বোঝাই। আসামীতে গিজ গিজ করছে।

হরিবল!···এক চোখে একটু দেখে নিয়ে ভোঁদড় হরিনামের ঝুলিটা কপালে ঠেকাল।

এতগুলো ঘটনা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঘটতে ইঁদুর আর কাঠবিড়ালি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এরপর কি হবে? কে সওয়াল নেবে কে সাক্ষী দেবে?

ইঁদুর ভাই! হাতি আর ওনারা না হয় আসামী হলেন,—কিন্তু রাজার উকিলকেও কেন শোধন-কড়াইতে চড়ান হল?

ইঁদুর ঠিকমত জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল,—মাথা খারাপ, তাই। অমনি তার কোটের খুঁট ধরে কে যেন খুব জোরে টান মারল। চমকে

ফিরে তাকাতেই ইঁদুর দেখল একজন বেঁটে খাটো ওরাং, মাথা ভর্তি টাক, তার দিকে পিট পিট করে চাইছে।

ঠিক বলেছো! আমার মাথা—এক্কেবারে খারাপ—! টক্ টক্ করে নিজের টাকে দুবার টোকা মেরে বলল সে।

ইস্! ছাড় ছাড়! কোটের খুঁট ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল ইঁদুর,—সব্—বাই পাগোল! কি বিপদে পড়া গেল!

কিন্তু বিপদের তখন সবে শুরু। তারপরে কত কি ঘটবে তা কে জানত? নিঃশব্দে কখন গাধা এসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল তা ওরা জানতেও পারে নি!

কি বললে? ব্র্যাক করে জিজ্ঞাসা করল সে।

ভীষণ চমকে পিছনে চাইতেই ওদের চোখ গিয়ে পড়ল গাধার সন্ধানী চোখের মুঠোয়। সেই লোমশমুনীর মত মুখ। আর কান।

জবাব দাও! বললে গাধা। চোখ দুটো তার কাগজিলেবুর মত ফ্যাক ফ্যাক করছিল। ওরা নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল। তখন কড়াইটার দিকে জিভ বের করে দেখিয়ে টক্ টক্ গলায় গাধা বলল,

দেখেচো?

হঠাৎ ইঁদুর ঘুরে দাঁড়িয়ে সটান তাকাল গাধার চোখে।

দেখেচি! আর অনেক বেশি দেখেচি! আর সিধে বলে দিচ্চি যে তোমরা সবাই পাগোল!—বলে থুত্নী উঁচিয়ে ঠোঁট শক্ত করে এঁটে একটা যা-পারিস্-কর্-আমি-তো-বলে-দিলুম ভঙ্গীতে হাত দুটো পিছনে এঁটে রইল।

গাধা কোন জবাব দিল না। সে কেবল একদৃষ্টে তার নিজের পায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছিল। তারপর মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বলল,—

তোমরা মিছে কথা বলছ। আমাদের পা সকলেরই লম্বা।

ইস্! পাগল কি তা জান না? পাগল মানে মাথা খারাপ। ছটফট করে বলল কাঠবিড়ালি।

তা হলে মেনে নেও যে তোমরা মিছে কথা বল? অর্থাৎ যা সহজ মানে নয় তাই বল?

না, মোটেই না! তোমরা বদ্ধ উন্মাদ! আর ওই তোমাদের উনি,—বলে ইঁদুর তার পাইপটা ধরাতে ধরাতে সিংহাসনের দিকে ভুরু তুলে বলল,—উনিও।

চালাক চালাক হাসতে লাগল গাধা,—এক কথার তিনটে মানে—পা-গোল, মাথা খারাপ, আর উন্-মাদ! তোমাদের নিস্তার নেই! বিচার হবে।

কিন্তু ইঁদুর বেপরোয়া। টিটকিরী কেটে বলল,—আর কে বিচার করবেন শুনি? তোমরা ত রীতিমত আইনজ্ঞ! বিচার না করে কারও প্রাণদণ্ড হয় না। কিন্তু বিচার করবেন যিনি,—বলে একরাশ ধোঁওয়া ছেড়ে পাইপটা কড়াইয়ের দিকে দেখিয়ে বলল,—তিনি তো গরম তেলে ফুলকো লুচি হচ্ছেন!

ব্যস্! হৈ-চৈ সোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। সকল জীবজন্তুরা ভীড় করে এসে তর্ক শুনছিল। তারা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল—

অপমান! অপমান! আমাদের মহান আইনের প্রতি কটাক্ষ! বিচার সভার বেইজ্জতি! ওদের নাক উঁচু মেজাজ অসহ্য! খর্ব করো! কড়াইতে তোলো!

কিন্তু তা শোনা মাত্রই কড়াই থেকে চার পাঁচটা মাথা উঁচু হয়ে কানায় ঝুঁকে পড়ে চেঁচাতে লাগল,—উঁহু! উঁহু! উঁহু! এ—এট্টুও আর জায়গা নেই! আর পাঠিও না।

এখন একটা বিষম সংকট উপস্থিত হল। রাজার বিদূষক ক্রুর দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল কড়াইয়ের দিকে। সেখানে একটুও জায়গা নেই। কিন্তু বিনা কড়াইতে চাপিয়ে বিচারই বা হয় কেমনতর? বারে বারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওর চোখ দুটো ফিরে আসতে লাগল কড়াই থেকে। কারণ আসামী গুণে শেষ করা না গেলেও কড়াই যে মোটে একটা।

ইঁদুর কাঠবিড়ালির হাতটা তুলে নিয়ে বলল,—চল, আমরা নির্ভয়ে যেতে পারি।

গাধার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওরা দুজন এগিয়ে চলল। সত্যি সত্যি চলে যায় দেখে গাধা হঠাৎ পিছনের পা দুটো আকাশে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল। পাশে ছুটে এসে বলল,

তোমরা চলে যাচ্ছ যে বড় বলা নেই কওয়া নেই ?

আমরা রাজার কাছে যাচ্ছি। বললে ইঁদুর।

অসম্ভব ! এ কি মগের মুলুক, যে রাজার কাছে যাচ্ছ ?

না যাওয়ার ত কোন কারণ নেই।

যথেষ্ট আছে। তোমরা আসামী !

আমাদের অপরাধ কি ?

এ রাজ্যের প্রত্যেকে অপরাধী !

কি দোষে ?

কর্ম মাত্রই দোষের।

কিন্তু আমরা যে এ রাজ্যের বাসিন্দা নই।

সেইটেই ত বড় অপরাধ। তোমরা ভেবেছো দোষ নেই তেমন কোন বাইরে থাকাটা অপরাধ নয় ! ভীষণ অপরাধ। তার ক্ষমা নেই।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকল ওরা গাধার মুখের দিকে। আস্তে আস্তে লম্বা কান নাড়তে লাগল অপর জন।

— বুঝতে পারলে এতক্ষণে ? তোমাদের নিস্তার নেই। এগুলো,— চারদিকে দেখিয়ে সে বলল,—এগুলো যে দেখছ এর কোন অর্থ নেই। আসল ওই কড়াইটা। গরম তেল গায় লাগলেই তোমরা জানতে পারবে যে কত বড় অপরাধ করেছো বা করবে। তারপর তোমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে। রাজামশাই তোমাদের খেয়ে ফেলবেন।

হঠাৎ একটা বজ্রস্বর বেজে উঠল—

কে তোমরা ?

চমকে ফিরে তাকাল সবাই। কড়াইটার পাশ কাটিয়ে ওরা চলে

এসেছিল সিংহাসনের নীচে। রাজা উঠে দাঁড়িয়েছেন। স্বয়ং রাজা মুখ অন্ধকার করে চেয়ে আছেন তাদের দিকে। তাঁর আগুন গোলা চাউনীতে ঝলসে যাচ্ছে বনের গা আর জানোয়ারদের পিঠ। সে চাউনী দেখে সকলের প্রাণ কাঁকড়ার মত গর্তে লুকোবার চেষ্টা করল। কেবল কাঠবিড়ালি তাকিয়ে দেখল রাজার গোঁফজোড়া শরতের কাশফুলের মত ধপধপ করছে।

ওরা দুজন এগিয়ে খুব সম্ভ্রমভরে নমস্কার করল রাজাধিরাজকে।

—আমরা প্রবাসী। বিদেশী। আমরা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। বললে ইঁদুর।

কিন্তু রাজা সন্দ সন্দ ভাবে চেয়ে থাকলেন।

হুঁ হুঁ ?

আমি হলেম পূর্ব বনরাজ্যের গেছো ইঁদুর। আর এই আমার বন্ধু কাঠবিড়ালি—চিন্তামণি তীরের বাদাম বৃক্ষে নিবাস।

গাধা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বলল,—মহারাজ, বিদেশী বলে তাহলে ওদের বিচার কর্তব্য।

চোপরও ! ফ্যাস্ করে উঠল চিতাবাঘ,—দেখছিস নে মহারাজ স্বয়ং বিদেশীদের সংগে কথা বলছেন ?

ছিটকে পিছিয়ে এল গাধা। কিন্তু রাজার মাসতুতো ভাই সিঙ্গি রাজাকে এই ভাবে দুটো ক্ষুদে জীবের সঙ্গে কথা কইতে দেখে খুব বেখুশি হল। ফিরিঙ্গি দুচোখ কটমটিয়ে চেয়ে রাজার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল,—এরা ?

ইঁদুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল,—আমায় চিনতে পারছেন না সিঙ্গিমশাই ? আমার জ্যেঠদাদু সেই সেবার আপনার দাদাভাই ফাঁসে আটকা পড়লে তাঁর পায়ের গেরো কেটে দিয়েছিলেন ?

অঁ—হঃ! মুখ ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে সিঙ্গি বিরক্তির আওয়াজ করল। ফাঁসে পড়ার কথাটা এখানে না বলাই উচিত ছিল। কারণ সে কাহিনীটা বড়ই লজ্জার, আত্মসম্মানে আঘাত করল সিঙ্গির। কিছুক্ষণ গুম হয়ে

থেকে হঠাৎ ফিরে চেয়ে সিঙ্গি বলল,—রাজাভাই! এই ভবঘুরে দুটো বেজায় বেয়াদপ। ওদের ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে বের করে দেওয়া হোক সীমানা পার করে!

কিম্বা কাঠগড়ায় তোলা হোক। পিছন থেকে টিপ্পুনি কাটল গাধা।

রাজা কিন্তু শুনছিলেন না। তিনি একমনে দেখছিলেন ইঁদুরের বাহারে লাল টুকটুকে কোটটা যার সোনা মোড়া বোতামগুলো পালিশে ঝকমক করছিল। আর কাঠবিড়ালির ছিটফিটে ঘাসফুল আঁকা নীল গলাবন্ধটা।

সুন্দর! মনে মনে বললেন রাজা!

রাজাভাই! বলত ভবঘুরে দুটোকে সিধে পথটা একটু চিনিয়ে দিয়ে আসি!—সিঙ্গির রাগ পড়ে নি।

সে পথটা সিধে বৈকি? হা হা করে হাসতে লাগল গাধা,—চিনতে মোটেই হাঙ্গামা নেই!

মোটেই নেই! মুখে থাবা চাপা দিয়ে হাসি লুকিয়ে বলল পুমা।

ওরা চোখে চোখে কেমন কথাবার্তা বলছিল। কাঠবিড়ালির বেজায় ভয় ভয় করছিল। তার মনে হল সিংহের ফুলন্ত কেশর পূর্ণিমায় বান ডাকা গেরুয়া নদের মত বয়ে যাচ্ছে। সভার জন্তুরা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গোল হয়ে দেখছিল চেয়ে। সবারই মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি খেলা করছিল। ফুটন্ত কড়াইয়ের মাঝখানে সেই বিদঘুটে জানোয়ার কি যেন একটা মজার কথা বলে উঠল। সবাই শুনে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল এ ওর গায়। হাতি আর গণ্ডারের বিরাট শরীর হাসির চোটে গড়িয়ে ঠোকাঠুকি খেতে লাগল। ফুটন্ত তেল ছলকে ছপ ছপ করে পড়তে লাগল আগুনে আর হু-হু শিখা দাউ দাউ করে উঠল তাদের চারিপাশে। সভার জন্তু জানোয়ারদের বিকট হাসিভরা মুখগুলো আগুনের আভায় তামার মূর্তির মত দেখাচ্ছিল, তাদের ধারালো দাঁত ত্রিশূলের মত ঝক ঝক করছিল।

আর রাজার মুখ যেন একটা মুখোশ। কাঠবিড়ালির মনে হল সব

কথা সে ভুলে যাচ্ছে। কেবল রাজার একদৃষ্টে চেয়ে থাকা বড় বড় চোখ দুটো ছাড়া।

তোমরা আমার আকাশ লণ্ঠনে কালি দিয়েছ কেন ?

না মহারাজ, ওটা যে লণ্ঠন নয়। বলল ইঁদুর।

তবে কি ?

চাঁদ। আর গায় তার মস্ত এক মেঘের ওড়না।

চুপ! ঠোঁটে থাবা দিয়ে রাজা চোখ পাকিয়ে তাকালেন,—সব্বাই জেনে যাবে!

কেউ কি জানে না ? রাজার কাশফুলের মত ধপধপে গোঁফের দিকে চেয়ে কাঠবিড়ালি জানতে চাইল।

উঁহু! জেনে ফেললেই চাঁদকে ওরা বলবে চাঁদ। ভোর রাতে ওরা খুঁজে বেড়াবে শুকতারা। আর সেগুনকে বলবে সেগুন।

সেগুন ?

ওই যে চারিদিকে।—বলে রাজা থাবা তুলে দেখালেন চারিপাশে গভীর ছায়াছায়া স্থির বনটার দিকে। তারা দেখল সার সার কালো ছায়াগুলোর মাথায় একটা তারা দপ দপ করে জ্বলছে।

রাজা, তাহলে সেগুনকে ওরা কি বলে ?

বলে আমার ছায়া।

আর ওই তারাটা ?

ওটা আমার গলার হারের মধ্যমণি।

কিন্তু সত্যি যে তা মোটেই নয়। একগুঁয়ের মত বলল ওরা।

সত্যি, যদি কথাটা মেনে নাও।

রাজা মুখ তুলে চাইলেন আবার আকাশের দিকে। ওরাও চাইল সে দিকে। তখন সত্যিই মনে হল কালো ডোরাকাটা প্রকাণ্ড ছায়া একটা ছড়িয়ে আকাশের গায়। আর অস্পষ্ট ঈষদাভ মেঘের গলায় দুলছে তারার হার। মধ্যে সেই মস্ত তারা। আর চাঁদের ফুটফুটে মুখখানি কালি হয়ে গেছে।

রাজা চেয়ে চেয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর করুণ গভীর সুরে বললেন,—তোমাদের এখন বিচার হবে।

অমনি সভার সকল জন্তু জানোয়ারেরা গর্জন করে উঠল। তারা এক একটা ডাক দিতে লাগল যেমন সন্ধিপূজোর রাত শেষে ঢাক বেজে ওঠে। যেমন বাজ পড়ে বড় বড় গাছের বুক জ্বলে ওঠে। যেমন প্রকাণ্ড বটের পুরোনো ডাল হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে।

সে ঐকতান গর্জন মনে হল মহাবনের সমস্তটা জুড়ে উঠছে। হিংসায় অধীর পশুরা ছটফট করছে ন্যায় বিচারের মহোল্লাসে। তাদের জ্বলন্ত চাউনী সেঁকে যেতে লাগল ওদের গা।

দুজন সিংঅলা সেপাই এসে কাঠবিড়ালি আর ইঁদুরের হাত দুটো বগলে তুলে নিয়ে বলল,—চলো অব্ কড়াহিমে!

ইঁদুর রাজার দিকে ফিরে ভীষণ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল,—রাজা এ সব মিথ্যে মিথ্যে!

রাজা তাড়াতাড়ি কানে থাবা চাপা দিয়ে বললেন, না—স—ব্ সত্যি—সত্যি—!

চোখের সামনে ওদের কালো পাহাড়ের মত জেগে উঠল কড়াইয়ের ঢালু গা। ডুমো ডুমো গজালের মাথাগুলো সারি সারি নেমেছে ওপর থেকে নীচে, তারপর চুল্লীর গনগনে আগুনে তেতে লাল হয়ে উঠেছে। আগুনের শিখা লকলক করে চেটে চেটে উঠছে চারিধারে। তেল ছলকে গড়িয়ে পড়ছে কড়াইয়ের গা বেয়ে, যখন আসামীরা ভিতরে কখন কোনো মস্করায় দারুণ হেসে উঠছে। আর ধোঁওয়া উঠছে মীনারের মত চূড়ো হয়ে। আড়ালে কয়েকটা মুখ গলা বাড়িয়ে ড্যাব ড্যাব করে দেখছিল কাঠবিড়ালিদের দিকে।

আসামী লোগ হাজির! হেঁকে বলল সেপাই দুজন।

কাঠবিড়ালি মুখ তুলে তাকাল। কি প্রকাণ্ড এ কড়াই! দেখতে দেখতে তা যেন আরও বড় হয়ে উঠছে। মনে হল তার মধ্যে একবার নামলে তল আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কালো তেল চকমক

করছে। কড়াইয়ের ইস্পাতের গা ভেদ করেও যেন দেখা যাচ্ছিল কত কালো তা। ফেনা উথলে উঠছে কানায়। তারপর ফোঁস করে মরে গিয়ে আবার ফুটে চলেছে একটানা বগ-বগ্! বগ-বগ্!

চুল্লীর ভিতর আগুন একবার ফুঁসে উঠল দাই দাউ করে। শিখা ছিটকে বেরিয়ে এল ফাঁক দিয়ে। নানা রঙের তারাবাজির মত স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে পড়ল। উত্তাপের বড় বড় ঢেউ এসে লাগতে লাগল ওদের চোখে মুখে। ঝলসে যেতে লাগল। তাড়াতাড়ি দুহাতে মুখ ঢাকল কাঠবিড়ালি। কিন্তু ইঁদুরের মুখ বড় কঠিন। ওর চোখ দুটোয় আগুনের শিখা জ্বলছিল দ্বিগুণ।

কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতি আর গণ্ডার, মোষ, শিম্পাঞ্জী, আর সেই বিটকেল কিম্ভুত—এদের শরীরে কি আঁচটুকুও লাগছে না! ওরা ত দিব্যি খোশগল্প করছে। কেবল শিম্পাঞ্জীর মুখের বর্ণ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। ভাজা পকোড়ির মত মুচমুচে দেখাচ্ছে।

ইস্! একটুও ছ্যাঁকা লাগছে না ওদের গায়! বললে কাঠবিড়ালি।

ভয়ংকর মোটা চামড়া কিনা! বললে ইঁদুর।

হয়ত দুনিয়ায় এমন কিচ্ছু নেই যাতে ওদের ছ্যাঁকা লাগে। কিন্তু ওই গরম তেলে তারা কি জ্যান্ত থাকবে? ভাবল মনে মনে কাঠবিড়ালি। ওরা কি সেই দারুণ নিকষ ফুটন্ত কালো তেলে নিঃশ্বাস নিতে পারবে? আর বেশি দেরী নেই। ওরা মই আনতে গিয়েছে। তার পর . . .

আকাশের বুকে কালো মেঘটা চাঁদকে ঘিরে থমথম করছিল। কাঠবিড়ালির মনে পড়ল তার সুন্দর নদী চিন্তামণির কিনারে তামার কোষাকুষি লালপাতা হাতে দাঁড়িয়ে বাদাম গাছ। মৌন। আর নদীর জলে দিন আর রাত মুখ দেখে। সোনার মুকুট মাথায় সূর্যদেব ভোর হলে সাত ঘোড়ার রথে চেপে পার হবেন। আর রাত্তিরে নীলকান্ত আকাশটা মুদে আসবে প্রজাপতির ডানার মত। সে কি আর ফিরে

যাবে না? পিছন ফিরে তাকাতে ভয় করছিল। জোড়া জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ দেখছে ওদের দিকে, চুল্লীর আভায় উজ্জ্বল ওদের মূর্তি দুটোকে। ইঁদুর কি ভাবছে অমন একভাবে? সে তাকাল ইঁদুরের দিকে। তার মুখ ভয়ানক গম্ভীর। মনে হল যেন একটা ভয়ংকর কথা মনে মনে ভাবছে সে।

কয়েকটা মুটে তখন একটা প্রকাণ্ড মই এনে লাগিয়ে দিল কড়াইয়ের গায়। অমনি গর্দভ এগিয়ে এসে কঠোর গলায় বলল,—ওঠ তোমরা! পাপের উচিত সাজা হোক!

একজন সেপাই কানে কানে বলল, কিচ্ছু ভেবো না! গিয়ে ঝুপুং করে বসে পড়বে ঠিক মধ্যিখানে।

ইঁদুর কোনো কথা না বলে মই বেয়ে উঠতে লাগল। কয়েক ধাপ উঠে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সটান বিদূষকের দিকে চেয়ে বলল, —তুমি একটা গাধা!!

কথাটার মধ্যে কি যেন ছিল। কি যেন যা অসম্ভব নিন্দের। অসম্ভব, তবু সত্যি। তাই কারও বিশ্বাস হল না কথাটা।

এ্যাঁ— গাধা? বলল একজন অবিশ্বাসের সুরে।

ছিঃ! অমন করে বলে! বললে আরেকজন।

আমি গাধা নই! রাগে কাঁপতে কাঁপতে অপমানে লজ্জায় নীল হয়ে চীৎকার করে উঠল গর্দভ।

কাঠবিড়ালি ইঁদুরের চোখে একটা ইসারা দেখতে পেয়ে রাজার দিকে চেয়ে বলল,—মহারাজ ও মানে না ও গাধা!

তবে রে বিশ্বাসঘাতক! তুই মানিস নে? গর্জে উঠল সিংহরাজ।

না! কক্ষনো না! কর্কশ গলায় জবাব দিল গর্দভ,—আমি শাস্ত্র পড়েছি, সাহিত্য পড়েছি, ন্যায় পড়েছি,—

তবে তুই মর্!

অমনি চারজন বরকন্দাজ এগিয়ে এসে তাকে কাঁধে তুলে ঝপাং করে ফেলে দিল গরম তেলে।

উঃ! উঃ! উঃ! মাগো—! আর্তনাদ করে উঠল গাধা,—পুড়ে গেল, জ্বলে গেল সারা গা—

বেশ হয়েছে! আরও পড়গে ব্যাকরণ কৌমুদী আর সমাস, আর পদকল্পতরু! নিঃশ্বাস ফেলে একধারে দাঁড়িয়ে ভোঁদড় ঝোলাটা কপালে ঠেকাল।

কাঠবিড়ালি কি করবে ভেবে না পেয়ে আরও এক ধাপ উঠেছিল। গণ্ডার কানা থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের দেখেই বলে উঠল,—এই তোমরা এস না। আর এট্টুও জায়গা নেই! যেটুক ছিল তাও গর্দভ শাস্ত্রী নিয়েছে।

তবে আমরা কি করব? মুখে হাত চোঙা করে ধরে জিজ্ঞাসা করল ওরা।

আজ নয়—কাল! কাল তোমাদের 'বিচার হ'লে রাজা জলপানের সঙ্গে তোমাদের খেয়ে ফেলবেন! এখন এস না লক্ষ্মীটি, আর একটুও জায়গা নেই।

তখন রাজার গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল।

—ওদের লোহার শেকলে বেঁধে নামিয়ে রেখে এসো আমার সপ্ত-পাতালের নীচে রাজকারাকক্ষে। কাল ওদের বিচার হবে। বললেন বনের মহারাজ।

কাল বিচার হবে! জয়! জয়! —কেঁপে উঠল বনভূমি জয়ধ্বনিতে।

ঝন্ ঝন্ করে দু জোড়া ভারী লোহার শেকল টেনে নিয়ে এল ইস্পাতের শিং মাথায় কয়েকটা জঙ্গী মেড়া। ঝনাৎ করে পরিয়ে দিল ইঁদুর আর কাঠবিড়ালির পায়ে। তারপর তালে তালে পা ফেলে চলল ওদের নিয়ে।

তের

সপ্ত পাতালের নীচে অন্ধকার রাজকারাকক্ষ। সেখানে একটুও শব্দ নেই। শান্ত্রীরা ফিরে চলে গেল। বলে গেল,—চুপটি করে বসে থাকবে! এখানে কেউ সাড়া দেয় না। কাল যখন শুকতারা জ্বলজ্বল করবে আকাশে আর ঢেপচুয়া পাখি বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকতে আরম্ভ করবে, তখন এসে নিয়ে যাব। ভোর রাতে তোমাদের বিচার হবে।

হড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পাথরের মেঝের উপর মেড়াদের নাল তোলা খুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল অল্প অল্প করে দূরে। নিঝুম হয়ে রইল দেয়ালগুলো।

বন্দী!

কাঠবিড়ালি আর ইঁদুর হাত ধরাধরি দাঁড়িয়েছিল। পায়ে তাদের শেকলগুলো প্রকাণ্ড আর ভারী। চারিদিক কালি আর কালি। রাতের গা চেঁছে সব কালি তুলে এনে লেপে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে। শব্দ নেই একটিও। শুধু সময় টিপ টিপ করে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। তার শব্দ ওরা শুনতে পাচ্ছিল, কারণ ওদের বুকের মধ্যে ছোট প্রাণী দুটো টিপ্‌ টিপ্‌—টিপ্‌ টিপ্‌ করে একতালে বেজে চলেছিল।

কাল ভোরে ওদের বিচার হবে। যখন বনের ছায়া কালি মুছে ফেলে রঙীন পোষাকে সাজবে। তখন রোদ এসে ছোঁবে নরম কচি পাতা। তাদের গা থেকে আঁধার মুছে যাবে। আর শিশির গড়িয়ে পড়বে টুপ করে ভোরের গন্ধ মেখে। আর বনের সেই সব ক্ষুদে ক্ষুদে জীবেরা, যারা পাতায়, ফুলের কোরকে, আর বাকলের ফাঁকে ফাঁকে রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকে। তারা রোদের সাড়া পেলেই ছুটোছুটি জুড়ে দেবে।

কাঠবিড়ালির খুব ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে পূব আকাশটা দেখে আসে। প্রভাত হতে কত দেরী। ভোরের কপালে রাঙাচন্দন তিলক ফুটেছে কিনা। সে ইঁদুরকে নিয়ে চিন্তামণি তীরের সকল জীবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। তার কোটরটা ছোট্ট। ইঁদুরের প্রাসাদের মত অত বড় বড় খিলান দেওয়া দালান তার নেই। তবু তার বসার ঘরটি কী সুন্দর! ইঁদুরকে সে দেখাবে তার মোটা মোটা গল্পের বইগুলো। আর ভাঁড়ারে কাচের বয়েমে ভরা লাল বাদাম। ফিরে গিয়েই সে তার কোটরের ঘুলঘুলির কবাট খুলে দেবে হাট করে। আর ছলাৎ করে চোখে পড়বে চিন্তামণির রূপুলী জল—রোদের ঝিকিমিকি দাগে খোদাই করা।···

ভোর হলে···!

কথাটা মনে আসতেই একরাশ কালো ফেনা এসে মুছে দিল সব ছবিগুলো। কাল রাত শেষে যখন শুকতারা চোখ মেলে চাইবে···

ইঁদুর ভাই!

কি?

কি ভাবছ?

ইঁদুর জবাব দিল না। সে ভাবছিল অনেক কিছু। শিকলে বাঁধা তাদের পা। সে কথা ঠিক। আর এই অতল পাতালে কিছু দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না। চারিদিকে পাথরের দেয়াল চিরকালের চুপ করা ভাবনায় স্থির। সে কথাও ঠিক। কিন্তু তবু,— তবু হতাশ সে হয় নি একটুও। অনেক কিছু ঘটতে পারে। হয়ত ওই মেড়া সেপাইগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে,···ভাবতে ভাবতে তার সমস্ত শরীর টান টান হয়ে উঠল। এখনও ভোর হতে অনেক— অনেক দেরী! তাড়াতাড়ি ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে সে ফন্দীটা বানাতে লাগল। হ্যাঁ! গেছো ইঁদুরকে খাবে এমন রাজা এখনও জন্মায় নি!

অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে চোখের পাতা তাদের ভারী হয়ে আসছিল।

হয়ত একটু তন্দ্রা এসেছিল কাঠবিড়ালির। একটা কাঠে কাঠ ঘষার মত আওয়াজ শুনে চমকে তাকাল সে। কুঠুরীর উঁচু এক কোণ থেকে চাইছে তুটো সরু সরু ছুঁচের মত জ্বলজ্বলে চোখ।

হেই !—বলল চোখ তুটো।

কে আবার ও ! কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কেবল চোখতুটো।

কে আপনি ?

আমি কেলে মাকড়সা। অন্ধকার পাতালে থাকি।

গা শিরশির করে উঠল ওদের।

পরিচয় কি ? আবার অন্ধকারে কাঠঘষা গলায় প্রশ্ন শোনা গেল।

আমরা বিদেশী !

সকলেই তাই ! এদেশে এক আমি ছাড়া কেউ নেই !

মাকড়সা চুপ করে একমনে দেখতে লাগল ওদের। তারপর সেই হলদে আলোর ছুঁচ চোখ তুটো নেমে আসতে লাগল কালিমাখা দেয়াল বেয়ে। ওদের মাথার একটু উপরে এসে থেমে গেল।

পোকা এনেছ ?

পোকা ?

এখানে যারা আসে তারা গা ভর্তি পোকা নিয়ে আসে। থাকে ত দাও তু একটা—খিদে পেয়েছে !

ওরা একটুও দেখতে পাচ্ছিল না তাকে। কেবল চিকচিক করছিল ওর তু চোখ।

মাকড় মশাই !

বলো।

ভোর হতে কতো দেরী !

ভোর হয় না।

তবে ?

সব সময়েই রাত্তির !

কালকেও ?

কালকেও।

আপনি কি করে বোঝেন যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে ?

তোমরা কিচ্ছু বোঝ না !—বিরক্ত হয়ে জবাব দিল মাকড়সা,—বলছি যে দিন বলে কিছু নেই।

না ! না !—বলছি কি করে বোঝেন যে রাত কাটছে ?

মাকড়সা একটু ভেবে বলল, —এবারেও ভুল। রাত কক্ষনো কাটে না। রাত শুধু দেখে আমি যখন কাটি। কাটতে কাটতে ফুরিয়ে গেলে রাত চোখ বুঁজে থাকে। রাতের বয়স কম কিনা, এখনও বুঝবার সময় হয় নি—!

ইঁদুর চুপ করে শুনছিল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—কিন্তু কি করে বোঝেন যে রাতের বয়স কম না বেশী ?

এটা আর শক্ত কি ? হাই তুলে বলল মাকড়সা,—আমার সুতোগুলো সব জোড়া দিলে রাতের বয়স বলে দিতে পারব। তার বয়স হল একশো সাতাশি অর্বুদ সুতো।

কাঠবিড়ালি ইঁদুরের কানে কানে বলল,—পা—গল !

ইঁদুর তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল,—আপনি ঘুমোন না মাকড় মশাই ?

ঘুম ? চোখ বন্ধ করা বলছ ?

হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করা আর স্বপন দেখা।

স্বপন কি ?

স্বপন হল এই সুন্দর ভালো রঙীন টুকটুকে মিষ্টি মিটমিটে অনে-ক ছবি। যেমন চোখ বুঁজে মিষ্টি পান্তোয়া খেতে ভাল লাগে তেমনি চমৎকার লাগে স্বপন দেখতে।

সে তো আমি দেখিনি কক্ষনো। আমার উনাশিটা চোখের দু একটা কখনো মুদে থাকে বটে, কিন্তু অন্যগুলো খোলা থাকে। নইলে রাত যদি একা একা পালিয়ে যায় ! আচ্ছা, সাদা ইঁদুর এলে জিজ্ঞাসা করবখন। সে অনেক ভাঁড়ারে যাতায়াত করে। দু একটা

স্বপন না পান্তোয়া কি ছাই বললে—এনে দিতে বলব।

ইঁদুরের নিঃশ্বাস থেমে গেল। সাদা ইঁদুর! চমকে উঠল সে। সে যে—! মাকড়সার দিকে ফিরে উত্তেজনা ভরা গলায় বলল, —সাদা ইঁদুর?

সপ্তপাতালের নীচে থাকে। রও আমি ডাকি।—বলে মাকড়সা সেই কালি মাখা দেওয়ালে তার আটটা পা দিয়ে একরকম টোকা দিতে লাগল। আর অনেক দূর থেকে একটু পরে শোনা গেল তেমনি এক আওয়াজ। যেন অনেকগুলো পা টিপটিপ বৃষ্টির শব্দের মত কোথাও পড়ছে।

তারপর সেই গুহাঘরের নিকষ কালো গায়ে ধারালো ফলার মত একটা আলোর হলুদ দাগ গিঁথে গেল। আর ছোট্ট একটা গর্ত থেকে মুখ বাড়ালো মোমবাতি হাতে ধরে একজন ইঁদুর। তার রং ধপধপে সাদা। এমন কি গোঁফগুলোও।

এস—! ডাকল মাকড়সা,—পিদীমটা বাইরে নামিয়ে রেখে এস। আমার রাতের চোখে বড় লাগে।

হা! হা! হা! হেসে উঠল সাদা ইঁদুর,—রাতের চোখে লাগে! হা হা!—আচ্ছা নামিয়ে রাখছি।—মোমবাতি একপাশে নামিয়ে রেখে গর্ত থেকে উঠে এল সে। তার গায়ে দুধের মত সাদা পোষাক লাল টুকটুকে পাড় দেওয়া। কোমরে সোনার চেন বাঁধা। খুব বিজ্ঞ হাবভাব। চেহারা গেছো ইঁদুরের মতই—কিন্তু গোঁফজোড়া তত সুশ্রী নয়।

মাকড়সা বলল,—তোমায় ডেকেচি একটা পরামর্শ করতে।

কিসের পরামর্শ?

একটা পা তুলে মাকড়সা কোণে অন্ধকারে দাঁড়ানো ইঁদুর আর কাঠবিড়ালিকে দেখিয়ে বলল,—এঁরা বিদেশী। আর এঁরা স্বপন দেখেন! সে নাকি দেখতে ভারী চমৎকার! আমার তাই জিনিসটা দেখতে ভারি সাধ হয়েছে। ভাবলাম তুমি ত সব ভাঁড়ারেরই খবর

রাখো—তু একটা স্বপন নিয়ে এসো না! বেশ পান্তোয়া দেখে স্বপন এনো তু চারটে!—বলে খুব আগ্রহের সঙ্গে চাইল মাকড়সা।



কিন্তু সাদা ইঁতুরের কানে তার কথা পৌছল না। মাকড়সা যেখানে দেখিয়েছিল সে দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল সে। তাকিয়ে থেকে থেকে হঠাৎ দৌড়ে এগিয়ে এসে মোমবাতি তুলে ধরল ওদের মুখের সামনে—

গেছো ইঁতু-উর্! তুমি এখেনে কি কোচ্চো!! সরু গলায় চীৎকার করে বলল সাদা ইত্ত্বঁর।

ইঁতুর চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। সাদা ইঁতুরের দিকে চেয়ে সে চোখ দিয়ে দেখাল তার পায়ের দিকে। অন্যজন ঝুঁকে পড়ে দেখল মোটা শৃঙ্খলগুলোকে।

এ যে রাজার কড়া তোমাদের পায়ে—! ফিস্‌ফিস্ করে বলল সাদা ইঁতুর। গেছো ইঁতুর ঘাড় নাড়ল।

কখন ?

যখন শুকতারা উঠবে!

যখন শুকতারা উঠবে ?

চুপ করে থাকল ওরা। সাদা ইঁতুরের হাতে বাতিদান থেকে মোমের ফোটা গলে পড়তে লাগল টপ টপ করে, নীচে গোল ছায়ার মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল সেগুলো।

তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? ছটফট করে বলল মাকড়সা,—আমার স্বপনের কথা দেখি ভুলেই গেলে।

গেছো ইঁদুর বলল—ভোর হলেই মেড়া সেপাইরা ফিরে আসবে।

মাকড়সা সে কথা শুনতে পেল না। সে আঁধার কোণটায় কি যেন খুঁজতে লাগল।

কাঠবিড়ালি বলল,—শুকতারা উঠলে তারা আসবে বলে গেছে। নিশিপার থেকে দিনমণি যখন চাইবেন, তখন রাজার ঘুম ভাঙবে।

অনেক দূরে মাটির নরম বুকে স্বপনগুলো ছিঁড়িছিঁড়ি হয়ে এল। মাকড়সা সুতো কাটতে আরম্ভ করল। আর বিনিয়ে বিনিয়ে একটা ছড়া সুর করে বলতে লাগল—

স্বপন এনো রঙীন দেখে
সাত ভাঁড়ারের কৌটো থেকে—

সাদা ইঁদুর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল ইঁদুরদের পায়ের শেকল। তারপর কোন কথা না বলে ফিরে গেল সুড়ঙ্গের মুখটায়। সেখানে মিহি গলায় সে একটা ডাক দিল। সে ডাক সুতোর মত কেবলই খুলে খুলে এগিয়ে যেতে লাগল সপ্তপাতালের শত সহস্র পর্দা পেরিয়ে। অসংখ্য ছিদ্র আর গর্তে প্রবেশ করে আবার পাক খেয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু পরে অন্ধকারে ছোট ছোট পায়ের শব্দ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফিসফিসে আওয়াজের মত ভরে উঠল। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল সুড়ঙ্গের সরু বিবর-পথে উঠে আসছে সাদা ইঁদুরের দল লাইন বেঁধে। গুণে শেষ করা যায় না। তাদের হাতে এক একটা খনির বাতি মিটমিটিয়ে জ্বলছে। যেন একসার হলদে জোনাকি দুলে দুলে উঠছে। কাছে এলে পর ওরা দেখল প্রত্যেকের হাতে নানা যন্ত্রপাতি। হাতুড়ি, বাটালি, র‍্যাঁদা, রেত, করাত, তুরপুন, আগর, সাঁড়াশি আর কামার শালের হাপর। একজন, গলায় তার লাল সর্দারী গলাবন্ধ, এগিয়ে এসে বলল,—

কাজ কোথায়?

সাদা ইঁদুর ওদের পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,—এদের পায়ের শিকলগুলো শীগগির কেটে ফেল।

অমনি ইঁদুরেরা কাজে লেগে গেল। দমাদ্দম আওয়াজে কারাকক্ষ দুলতে লাগল। কিন্তু মেড়ারা যেমন বলেছিল,—কেউ শুনতে পায় না সে আওয়াজ। এমন কি তারাও না।

দেখতে দেখতে শেকলগুলো কুচিকুচি হয়ে গেল। ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

শীগগির পালিয়ে চল! বলল সাদা ইঁদুর, দুজনার হাত ধরে টেনে।

মাকড়সা দপ্ করে চেয়ে বলল—ও বুঝেচি, তোমরা চলে যাচ্ছ। আমি তবে বসে এখন সুতো কাটব। রাত আমার তাই দেখবে। তোমরা আর আসবে না?

সাদা ইঁদুর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। কান পেতে শুনছিল সে। গাঢ় অন্ধকারে গুহার দরজা পেরিয়ে অনেক দূর থেকে আসছিল একটা দ্রুত আওয়াজ। খট্‌-খট্! খট্‌-খট্! তালে তালে শান্ত্রীদের পা ফেলার শব্দ।

মাকড়সার দিকে চকিতে চেয়ে সে বলল—আসব! তারপর ওদের হাত ধরে ছুটে গেল ছোট্ট লুকোনা সুড়ঙ্গের মুখে।

স্বপন আনতে ভুলো না!

উঁহু! বলল সাদা ইঁদুর। তিনজন পিছন ফিরে আঁধার গুহা আর তার যক্ষ মাকড়সাকে বিদায় দিয়ে দৌড়ে চলল।

চৌদ্দ

সরু সুড়ঙ্গের পথ চলেছে মাটির বুকের মধ্যে। দুধারে পাথরের দেওয়ালে সরু সরু শিরা দাগ আঁকাবাঁকা। মোমবাতির নরম আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে আলোছায়া ফেলে লাফিয়ে চলেছে তাদের আগে। তাদের জুতোর আওয়াজ সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলছে। মাঝে মাঝে সাদা ইঁদুর থেমে দাঁড়িয়ে দেয়ালের গায় কি সব চিহ্ন খুঁজে দেখছিল। তারপর আবার চলছিল।

বিপদ যে এত সহজেই কাটবে কাঠবিড়ালি তা ভাবেও নি, কিন্তু এখন তারা নির্ভয়। তার হাসি পেল। রাজাবাহাদুর কি এখনও চোখ বুঁজে ভাবছেন? নাকি তাঁর আকাশ লণ্ঠনটার মুখ ঢাকা সেই কালো মেঘ সরে গিয়ে ফুটফুটে জোৎস্না ছিটিয়ে পড়েছে? হয়ত তিনি স্বপ্ন দেখছেন, ভোর বেলা তাঁর জলপান পেলেটে সাজিয়ে এনে দাঁড়ালেন বিদূষক মশাই। জলপান অবশ্য তারাই। সে আর গেছো ইঁদুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ইঁদুর তার পাইপটা বাঁ হাতে ধরে আছে, আরেক হাত কোমরে। সে তার গলার স্কার্ফটা পরিপাটি করে নিচ্ছে। মহারাজ পেলেটের দিকে চাইতেই তারা কুর্নিশ করল—

সুপ্রভাত মহারাজ!

সুপ্রভাত! বললেন রাজাবাহাদুর,—ভাল আছ ত? ঘুম ভাল হয়েছে?

চমৎকার! আপনার খিদে ভাল ত?

চমৎকার! তাহলে শুরু করা যাক?

কিন্তু তারপর মাথা কুটেও আর ভাবতে পারল না সে কিছু। হালুম? হয়ত তাই। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না।

সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে তারা কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে চলেছে। পাক খেয়ে খেয়ে তারা চলল। শেষে একটা বাঁক ঘুরতেই হু হু হাওয়া ছুটে এল সুড়ঙ্গের পথ ধরে। আর মোমবাতির নরম শিখাটা নিভে গেল দপ করে। তারা থমকে দাঁড়াল। হাওয়ায় ছিল একটা মিষ্টি ভিজে গন্ধ। সেই খোলা হাওয়া তারা টেনে নিল বুকের মধ্যে। অন্ধকার আর তত ভারী নয়। অনেক শব্দও শুনতে পেল। বাতাসের মৃদু শব্দ, লতাপাতা অল্প অল্প হাওয়ায় দোল খাওয়ার; ফুলের পাপড়ি খুলে যাওয়ার, শাখার গায় হাওয়ার নরম হাত বুলোনোর, পাতাদের চুমো খাওয়ার। অনেক ঘাস ফড়িংদের ডানার শব্দ, আর মোমবাতি-নেভা অন্ধকার পাথরের দেওয়ালে তা বেজে ওঠার শব্দ।

সাদা ইঁদুর এবার বলল, তোমরা পৌঁছে গেছ। পশ্চিম বনের সীমানা এই। আর ভয় নেই।

দু পা এগিয়ে যেতে তারায় ভরা বিরাট আকাশটা দেখা গেল সুড়ঙ্গের মাথায়। তারা বেরিয়ে এলো।

তোমাদের পৌঁছে দিলুম! এখন পথ তোমরা নিজেরাই খুঁজে পাবে।—সাদা ইঁদুর কান পেতে কি শুনতে লাগল,—তা হলে আমি ফিরে চলি!

কাঠবিড়ালি আর ইঁদুর কৃতজ্ঞতায় চাইল তার দিকে।

আবার দেখা হবে! বলল ওরা দুজন। তারা শুনতে পেল সুড়ঙ্গের ভিতর চকমকি ঠুকে সাদা ইঁদুর মোমবাতি ধরাচ্ছে। তারপর

আলোর হলুদ আভা ফুটে উঠল। আর সাদা ইঁদুরের ছায়া ছোট হতে হতে ছোট্ট হয়ে মিলিয়ে গেল দূরে···।

পিছনে ফিরে দেখল ওরা বনভূমি ফিকে হয়ে দাঁড়িয়ে। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে সেটা বনভূমির সীমানা। কখনো গাছের পাতায় নিঃশ্বাস ফেলার মত হাওয়া বয়ে আসছে। সেই গভীর নীরবতায় তারা যেন কথা বলে ওঠে। কি কথা তা কেউ জানে না। আর পূর্ণ চাঁদ হেলে পড়েছিল পশ্চিমে। সারা রাত চেয়ে চেয়ে তার চোখ ম্লান হয়ে এসেছে। তার রং কনক-চাঁপার পাপড়ির মত। সে রং জড়িয়ে গেছে বনভূমির গায়ে, গাছের সরু সরু চূড়োগুলোর ছায়া হেলে পড়েছে অনেক দূরে।

আর তাদের সামনে বয়ে চলেছে একটা সরু ছোট্ট নদী। অস্ত আলোয় রাশি রাশি সোনার কুচি ছড়িয়ে তার বুকে। কুয়াশা আর মিহি আঁধারে গাছের ছায়া ধরে ধরে নদী চলেছে রাতের ভিতর দিয়ে। আর প্রকাণ্ড বন পা ফেলে ফেলে তারই পাশাপাশি চলেছে।

তারা হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়াল সেই সরু নদীর তটে। ভিজে মাটির গায়ে নরম কচি শ্যাওলা। আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ফুল কুঁড়িরা চোখ বুঁজে ঘুমোচ্ছে। শিশির জমে উঠেছে তাদের চোখের বোঁজা পাতায়। আর কুয়াশার ছোট ছোট চাদর তাদের গায় বিছানো।

সব চুপটি করে আছে। কিন্তু কাঠবিড়ালি কান পেতে শুনছিল কি যেন। হ্যাঁ,—সে শুনতে পাচ্ছিল একটা কথা। সেটা সেই নদীর কথা —কিন্তু খুব আস্তে। কেবল তারই কানে কানে বলছিল। কত কি, আর অদ্ভূত। যেন নদী বলছিল—তার উপর ঝুঁকে মুখ দেখে কত দেবদারুর ঘন সবুজ ডাল, আর চন্দনা লাল টুকটুকে ঠোঁট বাড়িয়ে বসে থাকে। আর কাজল মেঘ এসে ছায়া ফেলে। আর বাদামের পাতা কেমন

রোজ একটুখানি সিঁদুর চুরী করে নেয় সূর্য-ডোবা আকাশের বাটি থেকে। আর জলের ওপর কাঁচপোকা একটা ঘাসের ডগায় ভর করে ঝুঁকে থাকে।

তার মনে পড়ল ক—ত— দিন সে বাড়ি ফেরেনি! বন্ধুরা রোজ নিশ্চয়ই ফিরে যায় তার কোটরের বন্ধ কেওয়ারীর দিকে চেয়ে। হয়ত বাদাম পাতায় গাছের তল এতদিনে ভরে গেছে। আচ্ছা সে কি পৃথিবীর স—ব কিছু দেখে ফেলেছে? মনে মনে চট করে একটা হিসেব করে নিল। সেই হনু সর্দার আর হুতোম বক্সী, ভল্লুকের কথক নাচ আর নথি বগলে খরগোসের ছুটে পালানো। কিন্তু শেষেরটা কি ভয়ঙ্কর! কালো আর অন্ধকার। আর রাজাবাহাদুরের চোখ নীল আগুনে ভরা।

কিন্তু শান্ত নদীর মৃদু ছোঁওয়ায় সব মুছে গেছে। আর আকাশে চেয়ে একটা মস্ত তারা। তার আলো রাজহাঁসের মত ডানা দুটি মুদে ভেসে যাচ্ছে অনেক অনেক দূরে।···

তখন জলের স্রোত ধরে ভাসতে ভাসতে এল একটা প্রকাণ্ড অচিন গাছের পাতা। ইঁদুর একটা শর কাঠি কুড়িয়ে সেটা ধরে ফেলল। শর কাঠিটা দু টুকরো করে ভেঙে একটা নিজে নিল, অন্যটা দিল কাঠ-বিড়ালিকে। পাতাটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুজনে চড়ে বসল তার উপরে। তারপর স্রোতের মুখে ছেড়ে দিল তাদের নৌকা। ইঁদুর বসল হালে। কাঠবিড়ালি দাঁড় বাইতে লাগল। স্রোত তাদের নিয়ে চলল খসখসের সারির মধ্যে দিয়ে, সাদা বালির চরের পাশ দিয়ে, নুড়ির গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

পশ্চিমে হেলে রইল চাঁদ। তার রং সোনার থালায় সিঁদুর ছিটানো। প্রকাণ্ড গাছগুলোর ছায়া লম্বা থেকে আরও লম্বা হয়ে এলিয়ে পড়ছিল ভুঁয়ে। আর বনশিউলির গন্ধে ভরে ছিল হাওয়া। আকাশ থেকে তখন সব তারারা এক এক করে নিভে যাচ্ছিল। কেবল সেই উজ্জ্বল তারাটা বাদে। সেটা শুকতারা।

